প্রবাস

শারদীয়া ১৪৩২ · আইআইএসসি



প্রবাস

আইআইএসসি শারদীয়া দুর্গোৎসব

সন ১৪৩২ | দ্বিতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় প্রকাশ: আশ্বিন, ১৪৩২। সেপ্টেম্বর, ২০২৫
প্রকাশক: আইআইএসসি শারদীয়া দুর্গোৎসব কমিটি

টীম 'প্রবাস'

প্রচ্ছদ (ফ্রন্ট): সায়ক মাজি
প্রচ্ছদ (ব্যাক): সায়ক মাজি
অলংকরণে: সায়ক মাজি, শ্রেয়ম মাইতি
সহযোগী সম্পাদক: শ্রেয়ম মাইতি, সায়ক মাজি, তন্ময় দত্ত
সম্পাদক: দেবস্মিতা মোদক

যারা পুজোসংখ্যা-জীবন কাটাতে পারল না তাদের জন্য...

সম্পাদকীয়

প্রবাসের কথা

প্রিয় বন্ধুরা,

আমি প্রবাস। প্রবাসীও বটে। ১৪৩১ বঙ্গাব্দের, আশ্বিন মাসে আমার জন্ম ব্যাঙ্গালোরের আইআইএসসি তে। তারপর আমার পথচলা শুরু। দেখতে দেখতে, পূর্ণ করে ফেললাম গোটা একটা বছর। এই একবছর তোমাদের ব্যগে, পিঠে, হাতে করে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ ঘুরে, আবারও ফিরে এলাম তোমদেরই কাছে, তোমাদের কথা বলব বলে। ওহ্ ! আমি তো আবার কথা, বলতে পারিনা। বা হয়তো পারি, কিন্তু তাতে আওয়াজ কম, আর শব্দ বেশী। আর সেই শব্দগুলো যখন, আমার রূপ, রঙ, গন্ধের মাধ্যমে তোমাদের অন্তঃকরনে প্রবেশ করে, তখন প্রবাসে থেকেও মনে করিয়ে দিয়ে যায়, সেই ছেলেবেলার স্কুলে আগমনী অনুষ্ঠানের তোড়জোড়; বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার ধারের ঠেলা গাড়ি থেকে আলু কাবলি, আচার, ঝালমুড়ি, ঘটি-গরম কিনে খাওয়া; বৃষ্টির দিনে ব্যগে ছাতা থাকা সত্ত্বেও জুতো-মোজা হাতে করে নিয়ে জমে ওঠা জলে পা ডুবিয়ে হুড়োহুড়ি করা; বা হয়তো বাড়ি ফিরে নতুন জামাকাপড় গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়া গন্তব্য? দিদাবাড়ি। তারপর সারাদিন রাত ধরে বন্দুকের ক্যপ ফাটানো বা নতুন জুতো পড়ে হেঁটে পায়ে ফোস্কা ধরানো - নবমীর ভোগ প্রসাদে একস্ট্রা বেগুনীর মতো এ সবই উপরি পাওনা। মনে করিয়ে দিয়ে যায় অষ্টমীর অঞ্জলীতে খুঁজে পাওয়া কৈশোরে সেই প্রথম ভাললাগার কথা, যার নামটা আজও জানা হয়নি। পাঞ্জাবির সাথে শাড়ির কত না বলা কথা, ঘড়ির সাথে ওড়নার চোখ। আমি জানি, আজ তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেখান থেকে পিছন ফিরে দেখলে সব কিছুই বড্ড বেশী ধূষর। ফিকে হয়ে আসা স্মৃতির মণিকোঠা হাতড়ে যে দু-চারটে অরূপরতন আশা কর, তা যেন বাস্তবতার থেকে দূর, বহু বহুদূর। তাকে ধরতে মন ছুটে বেড়ায়, কিন্তু সঠিক ঠিকানার হদিস মেলেনা। কিন্তু প্রশ্ন হল, সব কিছুর ঠিকানা কী সবাই খুঁজে পায়? পায় না। তবে তাতে কী? কোথাও না কোথাও সবকিছুই নিজের ছাপ রেখে যায়। ঠিক যেমন তোমাদের চিন্তা এবং চেতনার ছাপ রয়ে যাবে আমার প্রতি বর্ণে, অক্ষরে, পৃষ্ঠায়। তা সে প্রচ্ছদে অঙ্কিত শক্তি ও শিবের সন্নয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের ছন্দই হোক বা সৃষ্টি ও ধ্বংসের দ্বন্দ, বরাবরের মতন মাতৃ আরাধনায় লীন হয়ে যাওয়াই হোক অথবা চিরাচরিত রীতি-নীতির গণ্ডি পেরিয়ে খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিওয়ার সাহস দেখানো - এমন হরেকরকম অনুভূতির পসড়া সাজিয়েছি, শুধু তোমাদের জন্য।

পড়ে জানিও কিন্তু, কেমন লাগল।

ইতি,

প্রবাস (দেবস্মিতা)

হে চিরন্তনী, এই স্থবির সময়ের প্রগতিশীল পরিবর্তন রূপে আমরা তোমার আবাহন করি...

আশ্বিন, ১৪৩২

সূচিপত্র

স্মৃতিকথা

১

প্রতীক্ষার অবসান

অয়ন কুমার গড়াই

৯

হারানো ডিসেম্বর

অয়ন কুমার গড়াই

প্রবন্ধ

২

বাড়ি ফেরা

রুদ্রনীল দাশ

৬

বেঙ্গালুরুর "বেঙ্গল"-যোগ

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

৪২

What is Durga Puja for Me?

Dipali Chackravarty

গল্প

৫

প্রতীক্ষারত

শুভ্রাংশু বিশ্বাস

৮

তোমার ছেলে বলছি

আবীর রায়

২৬

ফিরবো বললেই ফেরা যায় নাকি?

অভিষেক পাল

নাটক

৩৩

নিশির ডাক

রোহিত দত্ত

কমিক্স

১৫

Michael Faraday
An Another Genius

Anubhab Jana

কবিতা

৩

অন্য শহর

শ্রেয়ম মাইতি

১০

ঝিনুকের ফসিল

জাহাঙ্গীর লিটন

১৩

বিদায়

অভীক দাস

১৪

Phantom Limb

Lisa Nandy

২৮

কণ্টক

চিরন্তন (শাশ্বত)

৪০

বিচার চাই

সায়ন্ত গোস্বামী

৩

নতজানু

তমালি বসু

১০

প্রলাপ

কৌশিক রায়

১৪

Clandestine Night

Souvik Chakraborty

২৮

Her Eyes in the War

Manas Kundu

৩১

বেদুইন

শ্রেয়ম মাইতি

৪১

Unspoken Love's Ode

Ankur Chaudhuri

কবিতা

৪৩

মুখোশ

সমীপেন্দু দাস

৪৪

প্রেম করদান

নির্মাল্য নন্দী

৪৭

পাথরের ভালোবাসা

সৌম্যদীপ মাজী

৪৮

হতভাগ্যের ক্যালেন্ডার

প্রিয়েষ রায়

৪৯

অঙ্ক নাকি আতঙ্ক

রুদ্রদীপ দাস

৫১

Alma Mater

Souvik Chakraborty

৫৬

শেষের প্রার্থনা

আবীর রায়

৪৪

অপেক্ষা

সুজিত দাস

৪৬

উড়ান

সৌরভ দাস

৪৮

আমরা বড় হয়ে গেছি

সমীপেন্দু দাস

৪৯

উটপাখি জীবন

জাহাঙ্গীর লিটন

৪৯

জ্যোৎস্না

সায়ক শাসমল

৫৫

Abuse

Tanvi Agarwal

৫৬

মেঘ মিলন

চিরন্তন (শাশ্বত)

ভ্রমন কাহিনী

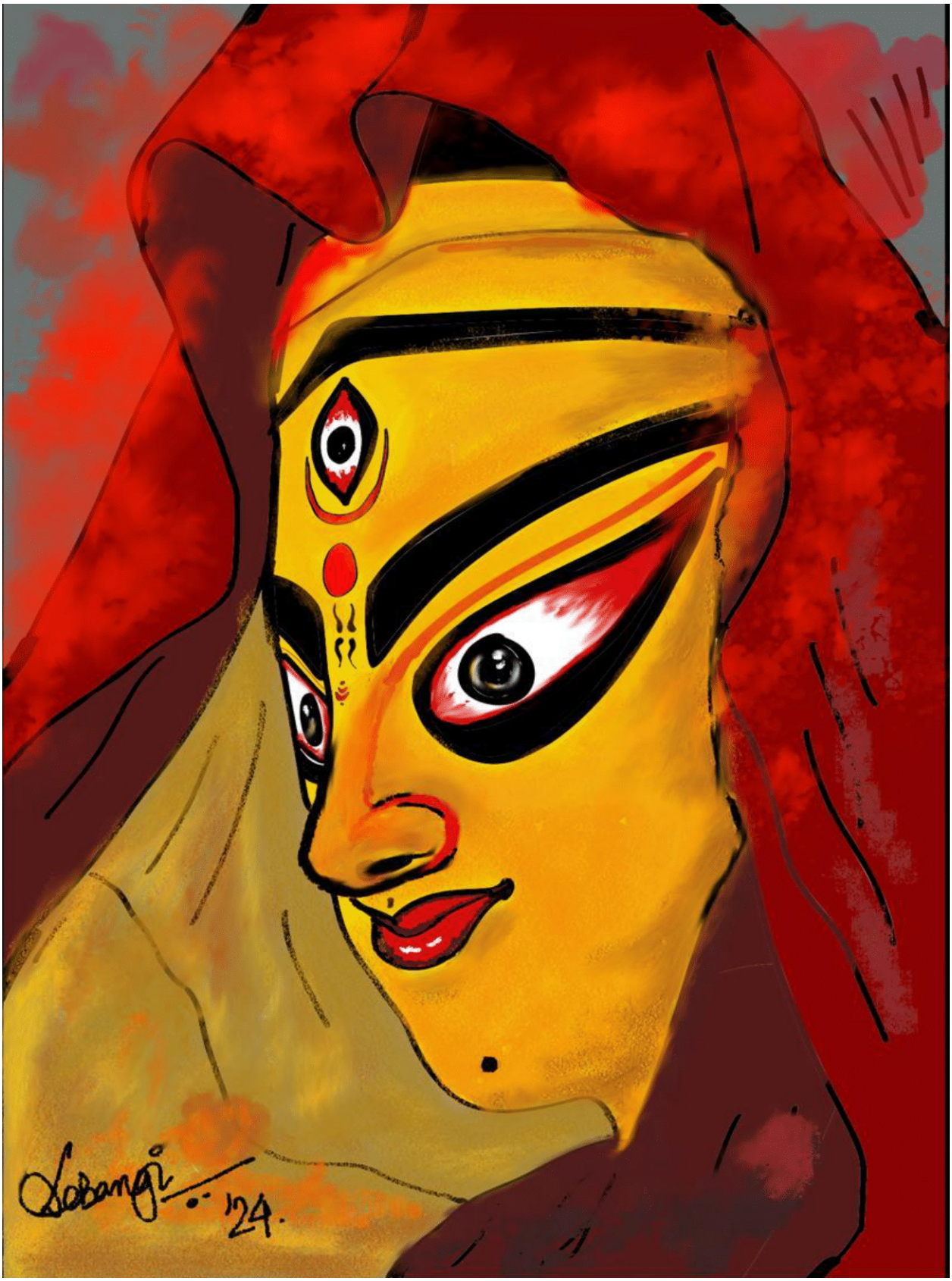
৫২
রানীর দরবারেঃ এক ভ্রমনপিপাসুর
উটি-অভিজ্ঞতা
দেবজ্যোতি মন্ডল

শব্দজব্দ

৫০ প্রশ্ন
৫৭ উত্তর

সুদোকু

৫০ প্রশ্ন
৫৭ উত্তর



মাতৃরূপেণ সংস্থিতা...

দেবাঙ্গী ভট্ট

প্রতীক্ষার আনন্দ

অয়ন কুমার গড়াই

সতেরো দিনের ছুটি কাটিয়ে ফেরার দিন। ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য ঝাপসা হয়ে যেতে যেতে আমি ভাবছিলাম, এই ফিরে আসাটা কেমন অন্য রকম হতে চলেছে। প্রতিবারই বাবা-মাকে আগেভাগেই খবর দিই। তাঁরা দিন গোনেন, "আর ক'টা রাত বাকি, ছেলে ফিরবে।" কিন্তু এবারে একেবারেই কিছু জানাইনি। মনে হলো, হঠাৎ করে গিয়ে তাঁদের অবাক করবো।

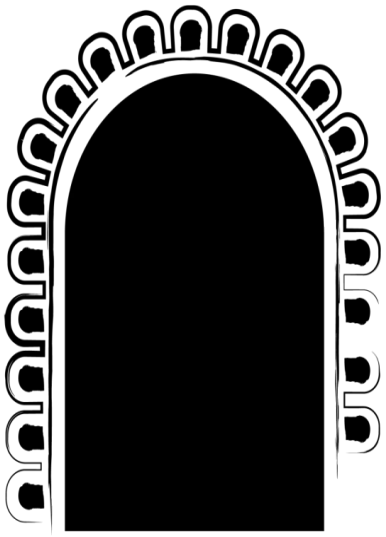
যেমন ভেবেছিলাম, তেমনই হলো। বাড়ির দরজার কাছে এসে ফোন করলাম। দিদি ফোন তুলতেই শুধু বললাম, "দরজা খোল।" কয়েক সেকেন্ড পর দরজা খুলতেই দিদির চোখে এক ঝলক বিস্ময় আর আনন্দ মিলেমিশে ছড়িয়ে পড়ল। ফোনের রিং শুনতে পাওয়ায় মা আধো ঘুমে উঠে দিদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই?" – মানে, ভাই ফোন করেছে কি? কিন্তু আমি যে হেঁটে হেঁটে ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেছি, সেটা তাঁর জানা ছিল না। হঠাৎ ঘুমচোখে আমায় সামনে দেখে মা কয়েক সেকেন্ড থমকে গেলেন। এক নিমেষে বিস্ময় আর আনন্দ মিলেমিশে যে আবহ তৈরি হলো, সেটাই আসল সারপ্রাইজ।

কিন্তু সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ মনে হলো – আনন্দ কি সত্যিই এই সারপ্রাইজের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি লুকিয়ে থাকে? নাকি এর থেকেও গভীর কোনো আনন্দ আছে, যা আমরা টের পাই না? কোনো একজন সুস্থ স্বাভাবিক বাঙালিকে যদি এক বছর সমস্ত সামাজিক মাধ্যম থেকে আলাদা করে রেখে হঠাৎ বলা হয় আজ দুর্গাপুজোর সপ্তমী, তাহলে তার পরিস্থিতি কী হতে পারে? হ্যাঁ, আনন্দে আত্মহারা হতে পারে, কিন্তু সে আনন্দ বড়জোর তিন-চার দিন টিকবে! অথচ, আসল আনন্দ তো শুরু হয় আরও আগে থেকেই। মহালয়ার অনেক আগে থেকেই পুজোর গন্ধ ভেসে আসে বাতাসে। দূরদর্শনের কোনায় কাউন্টডাউন চলতে থাকে। দিন গোনার সেই উত্তেজনা যেন প্রতিটি হৃদয়ে আগুন ধরায়। বাজারে তখন নতুন জামা-কাপড় কেনার ভিড়, দোকানে ভিড় সামলাতে হিমশিম খায় বিক্রেতারা। দর্জির দোকানে সারি সারি কাপড় জমে থাকে। শেষ মুহূর্তের সেলাইয়ের চাপ সামলাতে রাত জেগে কাজ করে দর্জিরা। ঘরে ঘরে নতুন জামা কাপড় আলমারিতে গুছিয়ে রাখা হয়, ছোটরা বারবার বের করে পরে দেখে আয়নার সামনে।

পাড়ায় পাড়ায় তখন প্যান্ডেল, প্রতিমা গড়ার কাজ চলে জোর কদমে। প্রথমে বাঁশ-খুঁটির কাঠামো, তারপর কাপড়, শোলা, আলো-তার। প্রতিদিন সেই কাঠামোর বদলে যাওয়া চেহারা দেখে মনে হয় যেন মা ক্রমশ কাছাকাছি চলে আসছেন। সন্ধ্যা নামলেই আলো জ্বলে ওঠে, বাতাসে বাজতে থাকে আগমনী গান। বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় শুরু হয় চিরচেনা আলোচনা – কে কোন দিনে কার সঙ্গে বেরোবে, কোন রুটে প্যান্ডেল হপিং হবে, কোন নতুন রেস্তরাঁয় খাওয়া যাবে। বাড়িতে মায়েরাও তখন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মুড়ি, মুড়কি, খই, নারকেল নাড়ু বানাতে। রান্নাঘর ভরে ওঠে সেই গন্ধে। প্রতীক্ষার এই আচার-অনুষ্ঠানগুলোই ধীরে ধীরে আনন্দের রং গাঢ় করে তোলে।

একই জিনিস ঘটে বাবা-মায়ের সঙ্গেও। আমি যখন ফোনে বলি, "আমি আসছি," তখন থেকেই তাঁদের আনন্দের শুরু। তাঁরা দিন গোনেন – কখন আসব, ক'দিন থাকব। রাতের পর রাত সেই স্বপ্ন দেখেন, খাওয়ার তালিকা বানান, মনে মনে গল্প জমিয়ে রাখেন। আমার ছুটি সতেরো দিনের হলেও, তাঁদের আনন্দ ছড়িয়ে থাকে আরও অনেক দিন – প্রায় এক মাস জুড়ে।

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় – আনন্দ কি হঠাৎ পাওয়া সারপ্রাইজে, নাকি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়? হয়তো দুটোর রূপ আলাদা। সারপ্রাইজ হলো আতসবাজির মতো – হঠাৎ আলোকোজ্জ্বল, তীব্র, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। আর প্রতীক্ষা হলো প্রদীপের আলো – নিরন্তর, কোমল, দীর্ঘস্থায়ী। সেদিন আমি বাবা-মাকে সারপ্রাইজ দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ভেবেছিলাম তাঁদের হয়তো সেই মাসখানেকের আনন্দটা কেড়ে নিলাম। তবুও তাঁদের চোখের উজ্জ্বলতা দেখে বুঝলাম, অপ্রত্যাশিত হোক বা প্রতীক্ষা, আসল আনন্দ একটাই – প্রিয় মানুষকে ফিরে পাওয়া।



বাড়ি ফেরা

রুদ্রনীল দাশ

প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা সপ্তাহ, প্রত্যেকটা মাস - এই প্রত্যেকটা সময়সীমার শেষে আসে একটা প্রত্যাশিত উপসংহার। যেই উপসংহারটি পরিচালনা করে আরেকটা নতুন শুরুর ।আমাদের কর্মক্ষেত্র, প্রতিশ্রুতি, কলেজ ,স্কুল এক একটা বয়সে এক একটা উপসংহারের মাধ্যম। এই উপসংহার আর শুরুর মধ্যের সাময়িক সময়টায় আমাদের পালন, বিশ্রাম, খামখেয়ালী চিন্তা পরিশেষে ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নেয় আমাদের বাড়ি।কিছু কিছু সৌভাগ্যবান মানুষরা বাড়িতে ফেরার সুযোগ পায়, বেশিরভাগ মানুষরাই হয়তো পায় না, তবে এই সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের মধ্যে টানা পড়েন চলতে থাকলেও উপসংহারটা আসবেই।

এবার প্রশ্নটা হচ্ছে এই সবকিছুর মধ্যে বাড়ির তাৎপর্যটা কি? বাড়ি কি শুধুই আমাদের শারীরিক অর্থনৈতিক, এবং মানসিক সম্বল, নাকি তার থেকেও বেশি কিছু? আমার মতে "বাড়ি" মানে স্বাধীন চিন্তার পাঠশালা, আমার বিবেক, আমার ছোট থেকে বড় হতে চাওয়ার নীতিবোধ, মূল্যবোধ, এবং মেরুদন্ডের উৎপত্তি। যেই অজানা উপসংহারের জন্য আমরা যাত্রাপথ শুরু করি সেই যাত্রাপথের সঠিক পথপ্রদর্শক আমাদের বাড়ি।

যেই বাচ্চা ছেলেটা তার মায়ের সাথে অতি সামান্য জীবিকার খাতিরে প্রত্যেকদিন শুকনো বাদাম আর ঝাল মুড়ি বিক্রি করতে বেরোয়, তার কাছে বাড়ি বলতে ক্ষণস্থায়ী বিশ্রাম, আগামির প্রস্তুতি। যেই মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকটি মোড়ের মাথায় চায়ের দোকান চালান তার কাছে বাড়ি মানে দিনের শেষে পরিশ্রমের অবসান, কাছের মানুষ, ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে থাকা বাচ্চা মেয়েটার ভবিষ্যতের প্রস্তুতি, রোজকার দেনাপাওনার মধ্যেও নিজের পছন্দের উপন্যাসটা পড়তে পারার অবকাশ। যে ছেলেটা কিংবা মেয়েটা সদ্য কলেজের সূত্রে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, তা অনিচ্ছা কিংবা ইচ্ছা সত্ত্বে তার কাছে বাড়ি মানে পেছনে ফেলে আসা অভিলাষগুলোকে জীবিত রাখতে চাওয়ার মাধ্যম। তার কাছে বাড়ি মানে শুধুই বাবা-মা। তার কাছে বাড়ি মানে সপ্তাহের বা সেমিস্টার শেষের বিশ্রাম। তার কাছে বাড়ি মানে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা ধুয়ে ফেলার অবকাশ। ব্যক্তিগতভাবে নিজে কলেজে আসার পর থেকে বাড়িতে ফেরার এবং নিয়মিত ভাবে ফেরার পক্ষপাতিত্ব করে এসেছি। অবাক হয়েছি, বলা ভালো বিস্মিত হয়েছি, তাদের দেখে যাদের বাড়ি ফিরতে পারার সম্ভাবনা গুলোকে স্বেচ্ছায় নষ্ট করে গেছে।

এক একজন মানুষের কাছে তার বাড়ি ফেরার সময়সীমা কিংবা কারনন এক একরকমের। কেউ কেউ বাড়ি ফেরে অনেক বছর পর, কেউ কেউ বাড়ি ফেরে কোন হঠাৎ পাওয়া খবরে, কেউ কেউ বাড়ি ফেরে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিতে। কেউ কেউ আবার বাড়ি ফেরে কোন চরম চাঞ্চল্যকর মুহূর্তে বা কোন কঠিন সিদ্ধান্তের অংশগ্রহণ করতে, ভবিষ্যৎকে প্রতিনিধিত্ব করতে, কিংবা ইচ্ছে এবং স্বপ্নগুলোকে উদযাপন করতে ,দূরে গিয়েও পাশে থাকার সংকল্প করতে, মোদ্দা কথা বাড়িতে না থাকার শূন্যস্থানটা একটা ক্ষণস্থায়ী কালের জন্য পূরণ করতে, যে শূন্যস্থানের সময়সীমা বোধ করি আমরা কেউই অনুমান করতে পারি না।

আমরা যখন একটা বাড়িতে থাকাকালীন আরেকটা বাড়ির নির্মাণকর্মে যুক্ত হই, সেই সময় আরেক রকমের ভিন্ন অনুভূতিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। আমরা চেষ্টা করি আমাদের নতুন বাড়িটাও ,আমাদের পুরনো বাড়িতে ফেলে আসা ইচ্ছা, অবকা্ এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনুভূতিগুলোকে সমান মর্যাদা দেবে। বাড়ির সদস্যদের তাদের নিজের মতন করে গ্রহণ করবে। পিছনে ফেলে আসা বাসস্থানের কখনো অমর্যাদা করবে না, তার সাথে জড়িয়ে থাকা বৈচিত্র্যময় স্মৃতিগুলোকে সাথে নিয়ে একটা নতুন ঠিকানায় শিকড় গাড়তে সহযোগিতা করবে, সহযোগিতা করবে তোমার বেড়ে ওঠার স্মৃতিচারণকে।

বাড়ি ফেরার সময়সীমা বা প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যখন কথা বলতে যাই তখন আরেকটা কথা চেতনায় বড্ড অনুরণন করতে থাকে,তা হচ্ছে "অপেক্ষা"। কালের পর কাল ধরে যে রাজকীয় অনুভূতিদের প্রতিনিধিত্ব করে গেছে আমাদের বাড়ি, তার অন্যতম হচ্ছে অপেক্ষা,বলা ভালো তোমার জন্য চির অপেক্ষায় থাকা কিছু মানুষজন। আমরা নিজেদের কর্মক্ষেত্র কিংবা প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যত দূরেই গিয়ে থাকি আমাদের চেতনা কিংবা দিনের শেষের ক্লান্তিতে অবচেতনায় কড়া নাড়ে "অপেক্ষা", যে বলতে চায়, মনে করাতে চায় তোমার ঘরে ফেরার অভিলাসকে, ভালবাসার মানুষগুলোকে, আবছা হয়ে আসা ইচ্ছে গুলোকে, তোমার বাড়ি ছেড়ে বেরোনোর কারনকে। যেই অপেক্ষার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে একটা সমগ্র প্রজাতির মেরুদন্ড, আমাদের দায়িত্ব এই অপেক্ষার যোগ্য মর্যাদা প্রদান করা, কোন সময় অজান্তেও আমরা যেন অপেক্ষাকে অবজ্ঞা বা অসম্মান না করি, অকৃতজ্ঞ না হই কারণ কোন প্রজাতির মেরুদন্ড তার সবচেয়ে বড় সম্বল তা দুর্বল হয়ে যাওয়া ভয়াবহ একটা ছবি দেখায়।

আমাদের সকল অনুভূতি, খামখেয়ালী চিন্তা, কিছু অপ্রত্যাশিত দুশ্চিন্তা, আমাদের প্রথম প্রেম, প্রথম প্রত্যাখ্যান, প্রথম উপার্জন, লাগাম ছাড়া আনন্দ, ভেঙে পড়ার পরাজয় অবশেষে মেনে নিয়ে এবং মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া - এই সব কিছু নিঃশব্দ শ্রোতা হয়ে থেকে যায় আমাদের বাড়ি। আমাদের বেড়ে ওঠা, আমাদের পড়ে যাওয়া, তার পরবর্তী উঠে দাঁড়ানো, আবার লড়াই করা,

কিছু অপ্রত্যাশিত ছন্দে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করা - এই সব কিছুর দৈনন্দিন রোজনামচার লেখক আমাদের বাড়ি, যার কাছে আমরা অজান্তেই নিজেদের জীবনযাত্রার রাজ্যপাঠ সমর্পণ করেছি, যার কাছে আমরা নির্দ্বিধায় নিজেদের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ করেছি, যার কাছে আমরা আমাদের আপনজনদের আগলে রাখার সংকল্প করেছি, সংকল্প করেছি তাদের ভালো থাকায় এবং সুস্থ থাকায় পাশে থাকার। আর এই প্রত্যেকটি সংকল্প পূরণেই হোক আমাদের বাড়ি ফেরা।

অন্য শহর

শ্রেয়ম মাইতি

এখন বরং মনের কথা থাক,
একটু পরে বৃষ্টি নামবে জোরে।
তখন নাহয় অনেক কথা বলো,
মুখটি গুঁজে আমার বুকের 'পরে।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে জানি,
এ শহরে থাকার যে দিন শেষ।
আমার তো কিছু করারই নেই রিনি,
যাওয়ার পর কেঁদোই খানিক বেশ।

নতুন শহর ভালো লাগবে জানো,
নতুন মানুষ, নতুন দোকানপাট।
আশা করি মানিয়ে নেব খুব,
ঘুরে দেখব সব রাস্তাঘাট।

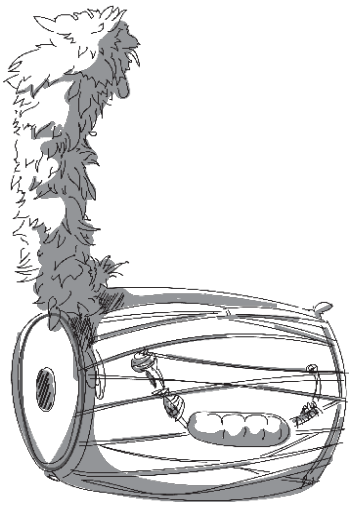
ওই যে দেখো বৃষ্টি এল ঝেঁপে,
এবার তুমি বলো তোমার কথা।
আমি এখন কুলুপ আঁটি মুখে,
তোমার কাঁধে রেখে আমার মাথা।

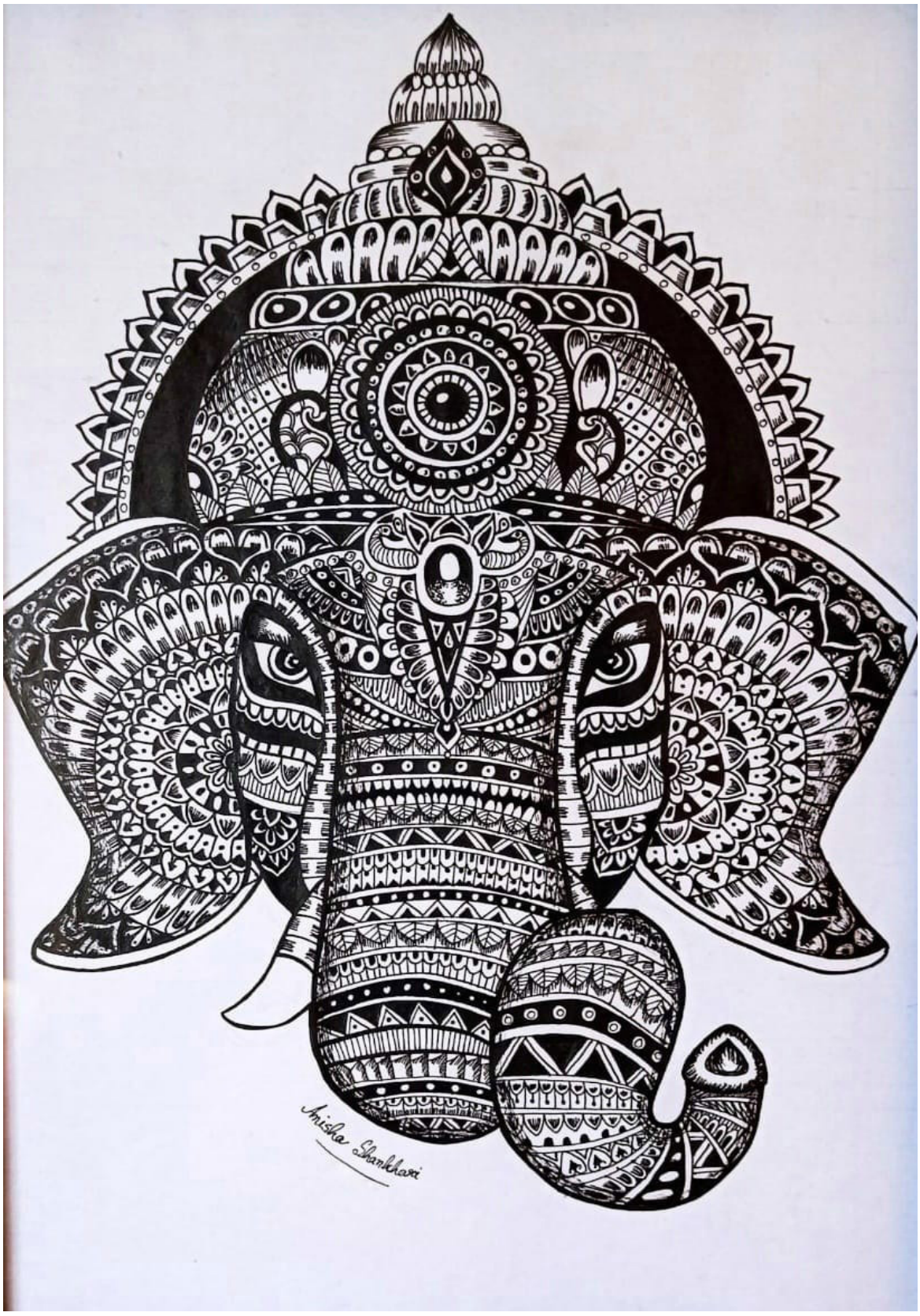
নতজানু

তমালি বসু

পাহাড়ের কোলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল...
অন্ধকার নামতে দেখেছিলাম আমি; একা।
যা ছিল আমার কল্পলোকের অলীক ভাবনা,
তাই কি আজ সত্যি হয়ে দেখা দিল?
দেবদারু বীথির বুকে ক্ষতের রক্ত
আজ জমাট বেঁধে কালচে হয়ে গেছে।
আমি বিচলিত হই নি।
সে তো আমার মতই ধ্বস্ত।
সানুদেশে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করি,
আমার প্রার্থনা কি ঘুম ভাঙাবে
হলুদ পাথরের দেবতাদের?
জানি না।
হঠাৎ কীসের শব্দে চমকিত হলাম।
দেবদারুর শেষ ঝরাপাতাটাও
সুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ের কোলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল...
শূণ্যতা নামতে দেখেছিলাম আমি; একা।





অনিষা শাঁখাঁরি

প্রতীক্ষারত

শুভ্রাংশু বিশ্বাস

শ্বেতাভর কথন: স্বর্ণালীর আসার কথা ছিল অন্তত দিন পনেরো আগে, এখনো এলো না; একটা খবরও ঠিকমতো দিচ্ছে না। কে জানে, অন্য কারোর আতিথ্য গ্রহণ করে আমার কথা বেমালুম ভুলে গেছে কিনা, সন্দেহ করবো? না না, মনটা বড়োই কলুষিত হয়ে যাচ্ছে, কথায় তো আছে, ভালো সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়, কিন্তু আর কত প্রতীক্ষা করবো? দূরভাষে খবর পাচ্ছি— নাম না জানা নদীকূলের প্লাবনভূমি থেকে জল ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, সেখানকার ছোট্ট অস্থায়ী জলাশয়ে শালুক-পদ্ম ফুটে উঠেছে, গঙ্গাফড়িং আনন্দ-উদ্ভাসিত হয়ে যথেচ্ছভাবে তিড়িং বিড়িং করে বেড়াচ্ছে... বলতে গেলে গলা ধরে আসে। স্বর্ণালী, তোমার লজ্জা লাগা উচিত, দারুণ লজ্জা! এই বিদ্যুতের গতিময়তার যুগে তুমি আমায় ত্যাগ ও তিতিক্ষা শেখানোর কথা ভাবছো বুঝি? তোমার জন্য একশো পাতা এক মুহূর্তের মধ্যে লিখিয়ে দেবো আমি, ধরতেও পারবেনা কীভাবে লিখলাম, বুঝবে তখন ঠেলা। তুমি জানোনা, তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পর আমার আরো বেশ কয়েকগুচ্ছ চুল ধূসর হয়েছে, রং করাইনি, তুমি তোমার মিষ্টি হাসি হেসে, 'বুড়ো' বলে আমায় নতুন রঙে রাঙিয়ে দেবে বলে। নিকষ কালো অন্ধকারে ভরিয়ে দেওয়া মৌসুমী মেঘ তখন নেহাতই দুলকি চালের হালকা তুলোর মেঘে অবনমিত হবে, উৎফুল্লতার মানসচক্ষে আমি তোমার দিকে প্রাণভরে তাকাবো, তোমার সীমার মাঝেই অসীমকে আমি খুঁজে পাবো। তুমি অবশ্য বলবে এসব গাঁজাখুরি, বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা শুনিয়ে আমাকে যুক্তিতর্কের আকণ্ঠ জ্ঞান দেবে। জানো, আমার পাড়ার ছোট্ট বাগানবাড়িটিতে বনখঞ্জন আনাগোনা শুরু করে দিয়েছে, সঙ্গিনীর প্রতীক্ষায় সে উদ্বেলিত হয়ে পড়ছে। ওর ব্যাকুলতার কথা বলে অবশ্য তোমার প্রতি কোনো সন্দেশ আমি পাঠাতে চাইনা— মিষ্টিমুখ প্রথমে করে নিলে পাতের সব খাবারই যে স্বাদহীন মনে হবে তোমার। তুমি হয়তো এখন অন্য কারোর নিগূঢ় প্রহেলিকার উদঘাটনে নিজেকে সমর্পণ করেছো, তোমার মনটা যে বড্ডো নরম! অবশ্য যত রাগ আর দুঃখের কথা বছরের এই সময়টাতে দেখা হলে তুমি আমাকেই মুখ ফুটে বলো কেন, আমি কি কৃষ্ণগহ্বর, যে সব মান-অভিমান গ্রাস করে নেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে? তুমি আমার কাছে কী তা জানিনা, শুধু অনুভব করি, মাঝে মধ্যে তোমার অনুপস্থিতিতে অশনি আশঙ্কায় মস্তিষ্কের কোষগুলো ছত্রভঙ্গ আচরণ শুরু করে, তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসো; তোমার স্পর্শে অনন্ত বিস্বাদ মুহূর্তরাও যে কেবল ক্ষণিকের মায়াজাল বলে মনে হবে, অন্তত সেটুকু অনুকম্পা করো তুমি!

স্বর্ণালীর কথন: শ্বেতাভ, বিশ্বপ্রকৃতি ধারাবাহিকভাবে যুগ যুগ ধরে একই নিয়ম পালন করে আসছে একথা ঠিক, তবে তা রাশিবিজ্ঞানের গড়ের হিসাবে, তার থেকে সামান্য পথভ্রষ্ট সে হতেই পারে, যেখানে সামান্য প্রজাপতির ঝাপটার সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সুনামির সম্পর্ক রয়েছে, সেখানে আমরা কি করেই বা সব নিয়ম মেনে চলবো বলো! তুমি হয়তো ভাবছো আমার বিলম্ব নিয়ে, কী করি বলো, কাজে ফেঁসে গেছি, আর প্রাচীন শাস্ত্রে তো বিধান দেওয়াই আছে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করে যাওয়ার। আমি যদিও তোমার সংস্পর্শে এসে কেমন যেন স্বার্থপর হয়ে গেছি, সুযোগ পেলেই তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি। হিসেব করে দেখেছি, এতে আমার কর্মজীবনের এক দশমাংশ সময়ের নিরিখে অপব্যয় হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে কর্মদক্ষতার এক দশমাংশ বৃদ্ধি পায়, সব মিলিয়ে এক শতাংশ ক্ষতি হওয়ার কথা| কিন্তু তোমার আঁখিতে কি আছে আমি জানিনা, ঐটুকু ক্ষতিস্বীকার আমি করে নিই। তোমার চোখের চিত্রকলায় হায়রোগ্লিফের দেশ থেকে আমাকে ক্লিওপেট্রার আসনে আসীন করাও তুমি, আমিও মোহিত হয়ে উপবিষ্ট হই। পেঁজা তুলোর মেঘে বসিয়ে আমায় ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্য থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়ে ভূমধ্যসাগরের ভিনদেশি ফুল-ফলের রাজ্যে নিয়ে যাও তুমি। তোমার নির্বাচিত ফুল আমি খোঁপায় গুঁজি, ফল আমি বিহঙ্গের থেকেও অধিক তৃপ্তি সহকারে খাই। এই সময় আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি, তোমার কাছে যাবো, বৃষ্টির মেঘ পার করে, টইটুম্বুর জলাশয়ে নীল আকাশের প্রতিফলন দেখতে দেখতে, একরাশ কথা জমে আছে।

শ্বেতাভ, তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আমার আবেগের আস্তাকুঁড় হিসেবে তোমায় ব্যবহার করি, তুমি সহজচিত্তে কেমন করে যেন সেসব বিগলিত করে আমাকেই তার সুধানির্যাস পান করিয়ে দাও! তুমি বিরক্ত হওনা কেন, না এসব শুধুই আমাকে আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা? আমার যুক্তিবোধকে তুড়ি মেরে এমন সব উত্তর দাও যে তোমাকে যুক্তি শেখানোর যুযুৎসায় আমার আবার আসতে ইচ্ছে করে। তোমার জায়গা কি আস্তে আস্তে সেজে উঠছে, রেললাইনের পাশে কাশফুল ফুটেছে কি? তোমার সঙ্গে থেকে থেকে জানতে ইচ্ছে করছে ওখানকার আকাশ-বাতাসের খবর— শিশির পড়া শুরু হয়েছে, না তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কের আগেই থমকে গেছে! আগেরবার তোমার চেহারায় কিছু অবনতি লক্ষ্য করেছিলাম, এবার আশা করবো তা যেন না দেখি। অবশ্য তুমি যা খামখেয়ালি, জোর ধমক না দিলে কাজ করবে না। নিশ্চয়ই আমার কথা অনবরত ভেবে যাচ্ছো এই সময়, চিন্তা করো না, বিরহকে একটু মধুর হতে দাও। অভিমানের বাক্স, বকুনির ঝুড়ি আর শপথের উপাখ্যান নিয়ে তোমার সঙ্গগুণে পরিপ্লুত হতে শীঘ্রই আমি আসছি।

বেঙ্গালুরুর 'বেঙ্গল'-যোগ

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

যে নামের উচ্চারণের বেশির ভাগটাই 'বেঙ্গল' নিয়ে রেখেছে, সেখানে বাঙালিদের যে কীর্তির অভাব হবে না তা বলাই বাহুল্য। তবে প্রশ্ন জাগে, গত তিন দশকে IT-শিল্পের প্রসারের ফলে আজকের বেঙ্গালুরুতে বাঙালিদের যে জনজোয়ার দেখতে পাই, সেটাই কি এই শহরে আমাদের একমাত্র 'কীর্তি'? বহু মানুষের বহু জীবনের ধারায় সঞ্জীবিত এই শহরে বাঙালিদের উৎপত্তি কি এতটাই সাম্প্রতিক? ইতিহাস অবশ্য সেকথা বলছে না। তাহলে চলো, স্মৃতির সরণি বেয়ে সময়ের আড্ডায় শুনে আসা যাক একালের শহরে সেকালের বাঙালিদের কিছু গল্প!

১৫৩৭-এ নাদাপ্রভু কেম্পেগৌড়ার হাতে বেঙ্গালুরুর গোড়াপত্তন। তখন এই জায়গা নিতান্তই একটি গ্রাম। প্রথমে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও আগামী ২৫০ বছরে মুঘল-মারাঠা-বিজাপুরী সুলতানদের হাত ঘুরে বেঙ্গালুরু শেষে টিপু সুলতানের দখলে আসে। ততদিনে সামরিক কৌশলগত কারণে এই অঞ্চলটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৭৯৯-এ টিপুর পতনের পর ব্রিটিশরা Wodeyar রাজাদের মাইসোরের সিংহাসনে বসিয়ে বেঙ্গালুরুকে নিজেদের আওতায় নিয়ে নেয়। এর পর থেকেই আধুনিক বেঙ্গালুরুর বেড়ে ওঠা। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে এখানে কোনো বাঙালির পা পড়েছে কিনা তা জানা যায় না।

১. ব্রাহ্ম সমাজ ও বিপিন পাল

দেশান্তরে বাঙালিদের ছড়িয়ে পড়ার শুরু নবজাগরণের সময় থেকে। রাজা রামমোহন (ইংল্যান্ড, ১৮৩০), প্রিন্স দ্বারকানাথ (ইংল্যান্ড, ১৮৪২), ও মাইকেল মধুসূদন (মাদ্রাস, ১৮৪৮) তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁদেরই মত এক বাঙালি যুবক, ১৮৬৪ সালে বোম্বে-মাদ্রাস হয়ে রেলপথে এ শহরে এসে পৌঁছন। তিনি তখন ব্রাহ্ম সমাজের উঠতি নেতা, কেশবচন্দ্র সেন। ভাব-প্রচারের কাজে ভারতভ্রমণে বেরিয়েছেন। অনেকের মতে, তিনিই এই শহরে আসা 'প্রথম আধুনিক বাঙালি'। তাঁর অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্গালোরের ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরটি (১৮৬৬) আজো সক্রিয়। কেশব সেনের পরে, ১৮৭৯-'৮০ নাগাদ ব্রাহ্ম সমাজের পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অমৃতলাল বসু (ইনি 'রসরাজ' নন) ব্যাঙ্গালোরে আসেন প্রচারের কাজে। এরপর, ১৮৮১-এর সেপ্টেম্বরে উলসূরের রায় বাহাদুর আর্কট নারায়ণস্বামী মুদালিয়ার হাইস্কুল (RBANMHS) এর হেডমাস্টার পদে যোগ দেন বাইশ বছরের তরুণ বিপিনচন্দ্র পাল। ১৮৮৩ অবধি তিনি সেই পদে ছিলেন। যে বিপিনচন্দ্রকে আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্ধর্ষ নেতা হিসেবে মনে রেখেছি, তিনিই যে ব্যাঙ্গালোরে আসা প্রথম বাঙালি চাকরিজীবীদের অন্যতম, তা হয়তো অনেকেরই অজানা!

২. স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীমা সারদা দেবী

১৮৯২-এর নভেম্বরে ব্যাঙ্গালোরে এসে পৌছন বছর ঊনত্রিশের স্বামী বিবেকানন্দ। গোয়ার মারগাঁও থেকে ধারওয়ার হয়ে ট্রেনে করে তিনি এসে নামেন আজকের KSR স্টেশনে। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ সেই স্টেশনের বাইরে শোভা পাচ্ছে স্বামীজির দীর্ঘদেহী ব্রোঞ্জয়ের মূর্তি। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ তখন পশ্চিম ভারত ঘুরে দাক্ষিণাত্যে এসেছেন। এখানে তাঁর সাথে মাইসোর স্টেটের দেওয়ান কে. শেষাদ্রি আইয়ারের পরিচয় হয় এবং তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় Majestic অঞ্চলে সুগপ্পা নামক জনৈক স্যাকরার বাড়ির উঠোনে একটি পাথরের বেঞ্চিতে স্বামীজী বিশ্রাম নিতেন। আজকের Basavanagudi রামকৃষ্ণ মঠে স্বামীজীর যে স্মৃতিমণ্ডপটি রয়েছে, সেটি এই পাথরটির ওপর স্থাপিত। A bridge and a gazebo স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ১৯০১ সালে উলসূরে স্থাপিত হয় বেদান্ত সোসাইটি, আজকে যেটি উলসূর রামকৃষ্ণ মঠ। ১৯০৬-এ স্বামী অভেদানন্দের পৌরোহিত্যে আজকের Basavanagudi রামকৃষ্ণ মঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এর কয়েক বছর পর, দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণের পথে ১৯১১-এর মার্চে, ব্যাঙ্গালোরে আসেন শ্রীমা সারদা দেবী। এখানে থাকাকালীন শ্রীমা বুল টেম্পল-সহ বেশ কিছু মন্দির দর্শন করেন। তাঁর স্পর্শধন্য 'Holy Mother's Rock' বা শ্রীমায়ের টিলাটি Basavanagudi মঠের একটি দর্শনীয় স্থান।

৩. রবীন্দ্রনাথ, 'শেষের কবিতা' ও RT নগর

কবিগুরু প্রথম ব্যাঙ্গালোরে আসেন ১৯১৯-এর জানুয়ারি মাসে, সর্বভারতীয় চারুকলা উৎসবের সভাপতি হয়ে। শহর জুড়ে বিরাট অভ্যর্থনার পর রাজ-অতিথি হিসেবে তাঁকে রাখা হয় Balabrooie গেস্ট হাউসে। ১৭০ বছরের পুরোনো এই ঐতিহ্যশালী বাড়িটি প্রথমে ছিল ব্যাঙ্গালোরের কমিশনার স্যার মার্ক কাবনের বাসস্থান, পরে তা মাইসোরের দেওয়ান ও আজকে চিফ সেক্রেটারীর বাসভবন। এই বাংলোর পাঁচ নম্বর ঘরটির দেওয়ালে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য একটি স্মারক। সেবারে লালবাগ-সহ বেশ কিছু জায়গা ঘুরে কবিগুরু মাইসোরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

A white building with columns এরপর সেপ্টেম্বর ১৯২২-এ দ্বিতীয়বার ও ১৯২৮-এ তৃতীয় এবং শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথ এ শহরে আসেন। ওঠেন আগের Balabrooie-তেই, সঙ্গে সস্ত্রীক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। এবারের উদ্দেশ্য, কবির স্বাস্থ্যোদ্ধার। কিছুটা সেরে উঠে রবীন্দ্রনাথ নতুন উদ্যমে, প্রায় দিন-রাত লিখে তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেন ও 'যোগাযোগ' অনেকটা

লিখে ফেলেন। সেবারে তাঁর 'শাপমোচন' ও 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য দুটি ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে। তাঁর নামে আজকের RT নগরের নামকরণ হয়।

৪. ব্যাঙ্গালোরের বাঙালি দেওয়ান ও আচার্য ব্রজেন শীল

রবি ঠাকুরের পরে Balabrooie বাংলোর ঠিকানায় উঠে আসেন আরেক বাঙালি। তিনি স্যার অ্যালবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জি, মাইসোর স্টেটের একমাত্র বাঙালি দেওয়ান (১৯২২-১৯২৬)। তাঁর জন্ম ব্রিস্টলে, এদেশে ফিরে ১৮৯৪-এ ICS হন। দেওয়ান হিসেবে তাঁর বিখ্যাত কীর্তি মাইসোর স্টেট ও মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির মধ্যে স্বাক্ষরিত ১৯২৪-এর কাবেরী জল-চুক্তি। পরের পঞ্চাশ বছর অব্দি কার্যকর ছিল সেই চুক্তিটি। ভাবলেও অবাক হতে হয়, আজ যে সমস্যা নিয়ে প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মধ্যে এত সংঘাত, একশো বছরেরও আগে এক বাঙালি সে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন!

এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির নেপথ্যে ছিলেন আরেক কৃতি বঙ্গসন্তান। তিনি 'বহুবিদ্যাবিশারদ' আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। অসামান্য প্রতিভাবান এই মানুষটি তখন মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯২১-১৯৩০)। মাইসোর রাজপরিবারের পক্ষ থেকে মাদ্রাসের সাথে আলাপ-আলোচনায় তিনি মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। ১৯২৮-এ অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের জন্য Balabrooieতে থাকার সব ব্যবস্থাপনা তাঁরই তত্ত্বাবধানে।

৫. IISc এর প্রথম বাঙালিরা

এবারে আসা যাক ঘরের কথায়। IISc-র আদিপর্বের ইতিহাসে যে কয়েকজন বাঙালি স্বমহিমায় ভাস্বর, তাঁদের অন্যতম ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র গুহ। ১৯২৮-এ অর্গানিক কেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান হিসেবে IISc-তে আসেন পঁয়ত্রিশ বছরের এই তরুণ বাঙালি প্রফেসর। জন্ম পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে, উচ্চশিক্ষা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে। IISc-র প্রথম বাঙালি প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তিনি স্মরণীয়। ১৯৫২ অবধি দীর্ঘ ২৪ বছর সসম্মানে সেই দায়িত্ব সামলেছেন।

১৯৩৯-এ IIScর প্রথম বাঙালি ডিরেক্টর হয়ে আসেন ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৯৩৯-১৯৪৮)। আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র জ্ঞানচন্দ্র, ছিলেন সত্যেন বোস ও মেঘনাদ সাহার সহপাঠী। দীর্ঘ নয় বছর ডিরেক্টর এবং একইসাথে Inorganic and Physical Chemistry (IPC) বিভাগের প্রধানের যুগ্ম-দায়িত্ব সামলেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেশের প্রগতির লক্ষ্যে মূলত তাঁর নেতৃত্বেই IISc-তে শুরু হয় Aeronautical (আজকের Aerospace) Engineering, Metallurgy (আজকের Materials Engineering), Chemical ও Mechanical Engineering বিভাগগুলি। পরে ডঃ ঘোষের হাতেই গড়ে ওঠে আজকের IIT খড়্গপুর (১৯৫১)।

সেই সময়ের বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ডঃ রাজেশ্বরী চ্যাটার্জির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩-এ তিনি গণিতে PhD শুরু করেন। ব্যাঙ্গালোর-প্রবাসী ডঃ চ্যাটার্জি IIScর প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ার ও PhD গ্র্যাজুয়েটদের অন্যতমা। ১৯৫৩-এ তিনি প্রফেসর হিসেবে Electrical Communication Engineering (ECE) বিভাগে যোগদান করেন, ও দীর্ঘ তিন দশক অধ্যাপনার পর ১৯৮২-তে অবসর নেন।

৬. সত্যজিৎ রায় ও 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি'

সিনেমাপ্রেমী বাঙালির নস্টালজিয়ার শীর্ষে থাকা যে মানুষটিকে নিয়ে না আলোচনা করলেই নয়, তিনিও এই শহরে কীর্তিমান! ১৯৭০এর নভেম্বরে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির প্রদর্শনীতে এসে ব্যাঙ্গালোর আকাশবাণীতে একটি সাক্ষাৎকার দেন সত্যজিৎ রায়। হেমন্তের নিঝুম ব্যাঙ্গালোরকে এতই মনে ধরে যায় মানিকবাবুর, যে এই শহরের প্লটেই গড়ে ওঠে তাঁর পরের প্রেতকাহিনী - 'ব্রাউন সাহেবের বাড়ি' (সন্দেশ, জুলাই ১৯৭১)। গল্পের সেই ভূতুড়ে বাড়িটির ঠিকানা: এভারগ্রিন লজ, ফ্রেজার টাউন, ব্যাঙ্গালোর। সেখানেই আত্মপ্রকাশ ঘটে এক অশরীরীর, আর তার সাক্ষী থাকে দুই বন্ধু, যাদের মধ্যে একজন আবার IIScর অধ্যাপক!

আজকের ফ্রেজার টাউন একটি জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড ডেস্টিনেশন হলেও এক সময়ে এ অঞ্চল ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সাহেবদের পাড়া। ২০১৮-এ রেডিও মির্চির দীপাঞ্জন ঘোষ গল্পের সেই বাড়িটির খোঁজে বেরিয়ে এই অঞ্চলে খুঁজে পেয়েছেন এমনই একটি বাংলো। সময় যেন থমকে গেছে দেড়শো-পেরোনো সেই বাড়িটির সামনে, নাম ফিলোমেনা প্যাভিলিয়ন। কে বলতে পারে, শীতের কোন এক সন্ধ্যায় হয়তো তার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল ব্রাউন সাহেবের স্নেহের 'সাইমন'!

* * *

বিস্ময়-বিমূঢ় আলেকজান্ডারের মতই যেন মনে হয়: "সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এ শহর!"- বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ, IIScর বাঙালি থেকে বাঙালি ICS, সত্যজিৎ রায় থেকে মান্না দে, বাঙালি মনীষার এমন অসাধারণ সমাহার খুব কম শহরেই দেখা যায়! তবে শুধুমাত্র বিখ্যাত বাঙালিরাই নন, বেঙ্গালুরু আপামর বঙ্গবাসীর। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, এ শহরে প্রায় তেরো লাখের ওপর বাঙালির বাস । একাধিকবার বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন', এসেছেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর মত অতিথিরা। উলসূরের বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজো এ শহরের সবচেয়ে পুরোনো পুজো, শুরু ১৯৪৮-এ।জয়মহল সর্বজনীনের পুজো এবছর সত্তরে পড়লো। সময়ের তালে তাল মিলিয়ে বাঙালি জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে পুজোর সংখ্যা। বর্তমানে দেড়শোরও বেশি দুর্গাপুজো হয় যে শহরে, তাকে নিঃসন্দেহে বাঙালির "সেকেন্ড হোম" বলা চলে। আজকের বেঙ্গালুরুর বিশ্বজনীনতা তাই যেন সার্থক ভাবে রূপ দিয়েছে বিশ্বকবির ভাষাকে - "...দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে - এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

তোমার ছেলে বলছি

আবীর রায়

সেপ্টেম্বরের এক পশলা বৃষ্টিতে বিকেলটা আজ বড় মনোরম লাগছে। পুজোর সময় বৃষ্টি নামা যেন কলিযুগের এক অলিখিত নিয়ম হয়ে গেছে। পুজোর কেনাকাটা আগেই সেরে রাখা হয়েছে, তাই এখন বাসে বসে খালি হাতে বৃষ্টি দেখা মোটেও মন্দ লাগছে না। তবে আজ যেন বাসটা অস্বাভাবিক ভিড়ে ঠাসা। অন্যদিন এত ভিড় থাকে না। অবশ্য, চতুর্থী বলে কথা। অনেকে কেনাকাটা সেরে ফিরছে, কেউ আবার অনেক দিন বাদে বাড়ি ফিরছে—হয়তো অনেকটা আমার মতোই।

জানলার দিকে তাকিয়ে এসব ভাবছিলাম, এমন সময় একটা কান্নার শব্দে ঘোর কাটল। তাকিয়ে দেখি, একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। তার পাশে বসা মা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বেশ দূরে বসলেও ব্যাপারটা বুঝতে খুব অসুবিধা হল না। ছেলেটাকে মা চারটে জামা কিনে দেবে বলে ছিল। হয়তো এবারে পুজোয় অতগুলো জামা হয়নি। তাই মায়ের পাশে বসে অভিমান করছে। মাকে কাঁদো-কাঁদো চোখে অভিযোগ করতে করতে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল সে। মা আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমনি করেই যদি সারা জীবনটা কেটে যেত, তাহলে বোধহয় কারও জীবনে কোনো অভিযোগ থাকত না।ওদের দেখতে দেখতে দিব্যি সময় কাটছিল। হঠাৎ ঠিক মাঝখানে একটা ছেলে এসে দাঁড়াল। তার পাশে সিটে বসা একটি মেয়ের সাথে কথা বলছে। কথাবার্তায় মনে হল সদ্য বিবাহিত। ছেলেটার মুখে উত্তেজনা স্পষ্ট। মেয়েটার মুখ দেখতে না পেলেও আন্দাজ করা কঠিন নয়—বিয়ের পর প্রথম পুজো হয়তো। জীবনে এরকম মুহূর্ত বারবার আসে না। আপনজনদের যেমন করে আঁকড়ে ধরে বাঁচা যায়, তা কয়জনের ভাগ্যে থাকে!

এসবই ভাবতে ভাবতে তাকিয়ে ছিলাম বাইরে। জ্যামে আটকে আছে বাসটা বেশ কিছুক্ষণ। পরের স্টপেই নামতে হবে আমার। হঠাৎ পিছনের সিটে কারও ফোন বেজে উঠল। এখন ভিড় একটু কম। তাকিয়ে দেখি, একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক একা বসে আছেন। ফোনটা আসতেই যেন খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। অল্পক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম, ওপাশে তাঁর মেয়ে কথা বলছে। আন্দাজ করলাম, মেয়েটির বয়স খুব বেশি নয়। ভদ্রলোকের পাশে রাখা ট্রলি ব্যাগ দেখে মনে হল, তিনি বাইরে থাকেন—হয়তো চাকরির জন্য। ঠিক তখনই বাসের উল্টো কোণ থেকে আরেকজন লোক ভদ্রলোকটিকে নাম ধরে ডাকল—"পরেশ!" বুঝলাম, ওরা পুরোনো বন্ধু।দু'জনের কথা-বার্তা শুরু হলো। কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম, ভদ্রলোক বাইরে চাকরি করেন। ছ'মাস বাদে এবার বাড়ি ফিরছেন। সত্যি ভাবলে অবাক লাগে—এই পুজোটার জন্য কত মানুষের জীবনে আনন্দ ফিরে আসে! আমার পাশে বসা আরেকজন বয়স্ক ভদ্রলোকও একই কথা বললেন। তাঁর সাথেও আলাপ জমল। শুনলাম, উনি আমারই পুরোনো পাড়ার মানুষ। তাঁর একটি মেয়ে আছে, যিনি স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকেন। সেখানেই মাস ছয়েক আগে তাদের একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান হয়েছে। এই পুজোয় প্রথমবার নাতনি বাড়ি ফিরবে। ভদ্রলোকের চোখমুখের ভাষাই বলে দিচ্ছিল—জীবনে তিনি কখনো এত খুশি হননি। কথা বলতে বলতে আমাদের দু'জনেরই স্টপ এসে গেল। নেমে পড়লাম বাস থেকে।

অনেক দিন বাদে ফিরলাম আমার ছোটবেলার বাড়িতে। সোজা চলে গেলাম আমার দুতলার ঘরে। দরজা খোলার সাথে সাথেই মনটা কেমন করে উঠল। সব জিনিসপত্র আগের মতোই পড়ে আছে। আমি ছ'মাসে একবার এখানে আসি বলেই হয়তো আর কেউ এ ঘরে থাকেনি। ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ল—ছোট একটা পুরনো আলমারি, তার পাশে স্টিলের খাট, আর সামনে সেই প্রিয় চেয়ার-টেবিল। টেবিলের উপর রাখা একটা ছবি। ছবিটা বিশ বছর আগের, কিন্তু একটা ভীষণ চেনা মুখ ভেসে আছে ছবিটাতে। মানুষটাকে বিশ বছর দেখিনি, তবুও তাঁর মুখ মনে হয় কালকের মতোই কাছে।ব্যাগ থেকে একটা মালা বের করে ছবিটার পরিয়ে দিলাম। আস্তে বললাম—"আমি ভালো আছি মা, বিশ্বাস করো।" চোখের জল মুছলাম। ঠিক তখনই বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল। ভারতী মাসি ডাকছিল। ঘরে ঢুকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল আমাকে। আমি মাসির জন্য কিনে আনা শাড়িটা দেখালাম। কিছুক্ষণ গল্প করার পর মাসি খেতে ডাকল। হাত-মুখ ধুয়ে নিচের হলঘরে গিয়ে বসলাম। প্রায় তিরিশজন নানা বয়সী ছেলে-মেয়ে আগেই বসেছিল। ওদের সঙ্গে আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে খাওয়া শেষ করলাম। খেতে খেতে যেন সব পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছিল। পাঁচ বছর বয়স থেকে তিন বছর আগের দিনগুলো পর্যন্ত—কত স্মৃতি যে এই ঘরে লুকিয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই।

খাওয়া শেষে ঘরে ফিরে চেয়ারটা টেনে মায়ের ছবির সামনে বসলাম। চোখ বুজে মায়ের মুখ মনে করার চেষ্টা করলাম। ঝাপসা-ঝাপসা কিছু ছবি ভেসে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পরে যেন হঠাৎই মনে পড়ল—মায়ের বিছানায় শুয়ে থাকা দৃশ্যটা। সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাটা থেমে গেল। এটা প্রথমবার নয়। এমন কতবার হয়েছে—মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে, দুপুরে ক্লাসের ফাঁকে—হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে।বাবাকে কোনোদিন দেখিনি। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করার সময় যখন বাবার মৃত্যুর খবর এসেছিল, আমার বয়স তখন মাত্র কয়েক মাস। তারপর থেকে মা-ই ছিল আমার সব। মা বেঁচে থাকতে কষ্টটা বুঝিনি, তাই হয়তো মা-ও এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। তখন আমার বয়স পাঁচ। সেই দিনটা ছিল আমার জন্মদিন। মা রান্নাঘরে গিয়েছিল মাংস রান্না করতে। হঠাৎ রান্নাঘরে আগুন লেগে গেল। সেদিন ভারতী মাসি আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আমাকে

নিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল সে। রাতেই মাকে শেষবার দেখেছিলাম, কিন্তু মুখটা চিনতে পারিনি। সেই মুখটা... আর ভাবতে পারি না।ঠিক তখনই নিচ থেকে ডাক এল। মাসি সবাইকে ডাকছে। প্যান্ডেলে ঠাকুর এসেছে। চোখের জল মুছে আমিও নেমে গেলাম।

নিচে নেমে প্যান্ডেলে এসে বসলাম। পাড়ার সবাই মোটামুটি আমায় চেনে—এখানেই আমার বড় হয়ে ওঠা, পড়াশোনা, সবকিছু। বছর তিনেক হলো চাকরির সূত্রে কলকাতায় থাকি, মাঝেমধ্যে এখানে ফিরে আসি। দুপুরে দেখলাম, ওই ছেলে-মেয়েগুলো ঠাকুর দেখছে। ওদের আনন্দ দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল। জীবন বোধহয় অবিচার করে না কখনো। যেমন মা-কে কেড়ে নিয়েছিল, তেমনই ভারতী মাসিকে এনে দিয়েছে আমার জীবনে।মাসি মা'র খুব ভালো বন্ধু ছিল। স্কুলের শিক্ষিকা, মা'র সহকর্মী। নিজের বলতে কেউ নেই, তাই রাস্তায় পড়ে থাকা ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে বাড়ি নিয়ে আসতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে তৈরি হলো এই অনাথ আশ্রম—যেখানে কেউ আর অনাথ নেই। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর জীবনে কেউ নেই, অনেকে তো নিজেদের মায়ের মুখও কোনোদিন দেখেনি। অথচ আজ তারা আনন্দে মেতে উঠেছে—'মা আসছেন' বলে কথা।প্রতিমার মুখটা হঠাৎ চোখে পড়ল। কেমন যেন মায়ের মতো মনে হলো। বাচ্চাগুলো তখন পাড়ার অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলছে। দূর থেকে দেখে কে বলবে তারা অনাথ? আজ আর কেউ অনাথ নেই। সবার মা-ই এখানে এসে গেছেন। মা নিয়ে আসেন বাবাকে মেয়ের কাছে, নাতনিকে দাদুর কাছে, প্রেমকে অভাগার কাছে।এইভাবেই এসো মা, প্রতিবছর ফিরে এসো। সত্যি বলছি, আজও তোমার কথা খুব মনে পড়ে।

হারানো ডিসেম্বর

অয়ন কুমার গড়াই

পরীক্ষা শেষ। বইপত্র গুছিয়ে রাখার সময়। পাঠ্যবইগুলো জমা দেওয়ার জন্য টেবিলে আলাদা করে রাখলাম, আর সহায়িকা আর প্রশ্নবিচিত্রা বাক্সে ভরার জন্য সাজিয়ে দিলাম। বিকেল পর্যন্ত এই কাজ করতে করতে কেটে গেল। অথচ মনটা তখনই ছটফট করছে—এই সেই মুহূর্ত, যার জন্য শেষ পনেরো দিন ধরে অপেক্ষা করেছি!

ব্যাট, বল, উইকেট সব রেডি। হঠাৎই বাবা বললেন, "এই টুপি পরে যা, আর সোয়েটারটা কোথায়?" আমি হেসে উত্তর দিলাম, "খেলতে খেলতে তো গরম লাগবে, আর সোয়েটার পরে কে খেলে!" বলেই সাইকেল নিয়ে ছুটলাম হাই স্কুলের মাঠে।

খেলা শুরু হলো। কিন্তু একি! একটা ম্যাচ শেষ হতেই অন্ধকার নেমে এলো। এতদিনের অপেক্ষা- পরীক্ষা শেষ হলে প্রাণভরে খেলব, সেই আশা কি তবে এক ঘণ্টাতেই শেষ? মনটা খারাপ হলেও, বন্ধুরা মিলে গল্পে বসে গেলাম। আহা, এ তো শীতকাল, অগ্রহায়ণ মাস। গ্রামের গোয়ালে গোয়ালে মশা তাড়ানোর জন্য ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে। মাঠের পাশের পুকর টার ওপর ধোঁয়াটাকে যেনো আকাশে মিশতে বাধা দিচ্ছে কেউ। দূরের মাঠের ওপারের রাস্তা দিয়ে ধান বোঝাই ট্রাক্টর গ্রামে ঢুকছে। কুয়াশার আড়ালে সব অস্পষ্ট হলেও ট্রাক্টরের শব্দ স্পষ্ট ভেসে আসছে। তখন ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে মনে হলো- সোয়েটার, টুপি কিছুই তো পরিনি! সাইকেলে বাড়ি ফেরার পর দেখি বাবা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। "বললাম যে সোয়েটার পরে যা! কোন সাড়ে পাঁচটায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আর এখন তো বাড়ি ফেরার সময় হলো?" আমি চুপচাপ শুনে হাত পা ধুয়ে ঘরে গিয়ে সোয়েটার টুপি সব পরে নিলাম।

এখন আর কোনো পড়ার চাপ নেই, ২৪ ডিসেম্বর রেজাল্ট না আসা পর্যন্ত শুধু খেলাধুলা, টিভি দেখা, সিনেমা দেখা, আর গল্পগুজব। শীতকাল- আমার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু, আর ডিসেম্বর আমার সবচেয়ে প্রিয় মাস। ছোটবেলা থেকেই শীতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত স্মৃতি! সকালে উঠে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার আনন্দ, রোদে চুপচাপ বসে থাকা, স্নান না করার জন্য গড়িমসি—শেষমেশ বাবার জোরাজুরিতে সাবান মেখে স্নান। দুপুরে খাওয়া শেষে ছাদে বসে ছবি আঁকা বা পরিবারের সবাই মিলে গল্প করা। ভোরবেলা মায়ের ইতু পূজার শঙ্খ বাজানো লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়েই শোনা—সবই যেন শীতের অমূল্য সম্পদ।

তবে এই ডিসেম্বরের আনন্দ ছিল শুধু ক্লাস নাইন পর্যন্তই। কারণ, তখন পর্যন্ত ডিসেম্বর মানেই ছিল একাডেমিক সেশনের সমাপ্তি, পরীক্ষার পর নির্ভেজাল ছুটি আর খেলাধুলার মুক্তি। পরের বছর তো মাধ্যমিক, ডিসেম্বর এ টেস্ট আর ফেব্রুয়ারি তে ফাইনাল- ডিসেম্বর আর পড়াহীন ছুটির মাস রইল না। তাই হয়তো সেই শৈশবের নিরুদ্বেগ আনন্দ ধীরে ধীরে কোথাও হারিয়ে গেল।

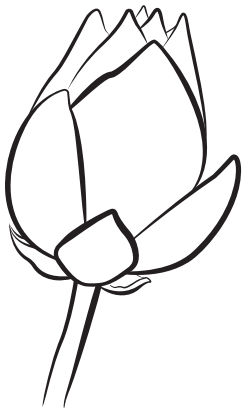
শীত শুধু এক ঋতুই নয়, শৈশবের হাজারো রঙিন ছবির খাতা। আর সেই খাতার শেষ পাতা যেন ক্লাস নাইনেই থেমে গেছে। তার পরের পাতাগুলোতেও শীত এসেছে, কুয়াশা নেমেছে, ধোঁয়া উঠেছে গোয়ালে- কিন্তু আগের মতো উচ্ছ্বাস আর আনন্দ আর ফিরে আসেনি। যেন শীত রয়ে গেছে, কিন্তু শৈশবের ডিসেম্বর আর নেই।

ঝিনুকের ফসিল

জাহাঙ্গীর লিটন

বুকের গভীরে লুকিয়ে থাকে যে প্রেম,
বুকের খাঁজে এসে কখন যে হারিয়ে যায়—
টের পাওয়া দায়।
বেনোজল সরে গেলে সারে সারে
পলি জমে তার গায়।
গভীরতা কোন ফাঁকে হয়ে গেছে সমতল,
বোঝা যায়নি এতকাল।
আমি কি না ডুবুরি হয়ে
মুক্তো খুঁজে ফিরেছি নিরন্তর—
সমতলে ফিরে এসে লাঙল সেচে
হাল জুড়ে ফের ক্লান্ত ঘামে
নুনের ব্যবসা ধরি।
নুন জোটে ঠিকই,
কিন্তু পান্তা জোটে না।
তবু চোখ রাখি দূর নক্ষত্রের পানে,
আশায় দিন যায়—
লাঙলের ফলায় মিলেই যাবে একদিন
ঝিনুকের ফসিল,

হারানো মুক্তো—
যদি সত্যিই মিলে যায়।



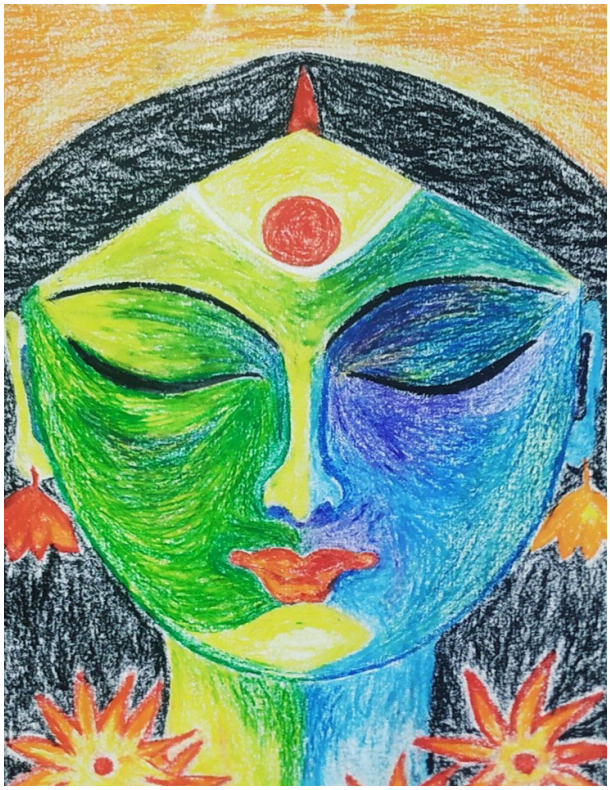
প্রলাপ

কৌশিক রায়

বুকে জমা কষ্টগুলো লাঘব করবে কে?
আরও একবার নতুন করে ঘুঁটি সাজাবে কে?
উপচে পড়া ভিড়ের মাঝে চেনা গন্ধের খোঁজে
অপেক্ষা ওই প্রতিধ্বনি উপেক্ষা করবে সে?
সাজানো সেই মিথ্যেকে বয়ে ব্যর্থ কথোপকথন দ
কথাগুলো সব পুড়ে যায়, শুরু হয় অধঃপতন।
অক্ষরে অক্ষরে যুদ্ধ হয়, শেষ হয়ে যায় শব্দ
কালির নেশায় বুঁদ হয়ে কলম হলো জব্দ।
সম্ভব যদি হতো তবে সময়কে করিতাম বন্দি
অসম্পূর্ণ বাক্যের খালি উড়ে বেড়াবার ফন্দি।
আলোছায়ার মায়াতে তার অল্প অভিমান,
সমীকরণের দুই দিকে, আবেগ তার সমান।
নতুন পুঁটি, নতুন চাল, শুরুতেই বাজিমাৎ
ওস্তাদের চাল শেষে আসে, পুরোটাই কিস্তিমাৎ।



বৃষ্টি কুন্ডু



দূর্বা ঘোষ



সায়ক মাজি



অনিষা শাঁখারি

বিদায়

অভীক দাস

শীতের সকালের সোনালি রোদের মতো
উষ্ণ হাতের ছোঁয়া
ছিন্ন করে
এগিয়ে গেলে তুমি
এয়ারপোর্টের দরজায়;
আঁচ করতে পেরেছিলে কি
আবার একসাথে
গঙ্গার বক্ষে নৌকায় হাতে হাত
ধরে ভেসে বেড়ানোর সেই প্রতিজ্ঞা
থেকে যাবে শুধু ভিসার
মেয়াদ ফুরোনোর তারিখটুকুতেই?

তাই কি চলে যাওয়ায় আগে
ছুটে এসে দিয়ে গেলে
তোমার হাতের ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ডটি?

প্লেন মাটি ছাড়ার পর যেই না
ফেরার জন্য পিছন ঘুরেছি,
অমনি আসলো সেই বিকট,
বুকের রক্ত জল করে দেওয়া
আওয়াজ।

পিছন ফিরতেই দেখলাম
পাঁচতলা বিল্ডিং সমান আগুন,
থিকথিক করে উঠছে
আলকাতরার মতো কালো ধোঁয়া।
এতদূর থেকেও টের পাচ্ছি
সেই বীভৎস, সুতীব্র, নির্মম দহনজ্বালা।

সেখানে যেতেই দেখলাম
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে
পুড়ে খাক হওয়া মৃতদেহ,
কারো খাবারের প্যাকেট,
কারও ছেঁড়া ব্যাগ; চটিজুতো
ছাইচাপা দেওয়া
বিমানের টিকিট,
পাসপোর্ট।

কারও মোবাইলে বেজে উঠেছে রিংটোন –
"শায়দ ইস জনম মে মুলাকাত হো না হো"
ওপারের জন জানে না
এই পাড়ে শুধু পুড়ে যাওয়ার গন্ধ,
দমকলের ছোটাছুটি,
অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন, স্ট্রেচার
প্রিয়জন হারানো মানুষের
তীব্র, বুক চিরে যাওয়া হাহাকার।

উড়ো জাহাজের ভাঙা টুকরোর নীচে
উদ্ধারকারী দলের সাথে
তোমায় আমি
খুঁজে চলেছি।
ডানহাতের কব্জিতে তোমার ব্যাণ্ডটি।

সুন্দর, মসৃণ, ভালোবাসায় ভরপুর সেই মুখটি
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে জেনেও –
শেষবারটি বিদায় দিয়ে আসতে,
আর না বলা কথাগুলি বলে আসতে।
তোমার একমাত্র না পুড়ে যাওয়া
স্মৃতিচিহ্ন শুধু
ফ্রেন্ডশিপ ব্যাণ্ডটি।



Clandestine Night

Souvik Chakraborty

The city sleeps its delectable slumber,
as I prepare to escape,
to wander,
far away from its protective embrace.

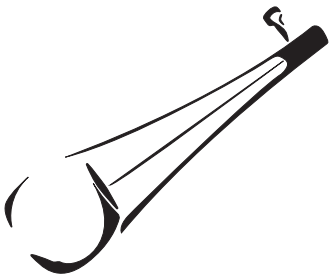
The beckon has been strong,
of vocation - reasons to ponder -
promises of 'brighter' days,
on the other side,
of validation,
likely not attained otherwise.

The starry sky is ethereal,
the moonbeams cast their spell -
will they follow me on my way?
As I step thousands of miles away.

When shall we meet next?
Will it ever be the same?
The old house, the long corridor,
and the cavernous city with its folklore.

Do not make me a part of your past yet.
The night is clandestine and uncertain it is.
And when the stars shine as bright,
in a land far away from sight,
follow them to you,
through the labyrinths of memory,
down a thousand light years,

I just might.



Phantom Limb

Lisa Nandy

You are my PHANTOM LIMB

You're like that realistic bird
Roaming around the pessimistic sky
In hope of finding something nobel
And the law of life different from others!

"And I am watching it
On top of a tall building kissing the same sky."

Using the entanglement, you are finding a way through the darkness.
And I try to entangle my mind in search of a coherent source in you.

If my mind slips and hit your realistic world
Don't measure it, it may collapse!
Don't interact with it or it loses its identity!
Just keep flying away from me
Crossing the Atlantic!!!

Remember you are always with me,
As you are my PHANTOM LIMB.

MICHAEL FARADAY

AN ANOTHER GENIUS

ANUBHAB JANA




BETWEEN THE LIFETIMES OF EINSTEIN AND NEWTON. THERE LIVED ANOTHER GENIUS, ONE OF EQUAL STATURE. A CHILD OF POVERTY OF WHOM NOTHING WAS EXPECTED. IN FACT, IF THIS MAN HAD NOT LIVED THE WORLD WE KNOW MIGHT NOT EXIST TODAY. THIS IS THE STORY OF HOW WE LEARNED TO MAKE ELECTRONS DO OUR BIDDING. THE MAN WHO SOLVED THE MYSTERY THAT STUMPED NEWTON, ALSO LAID THE FOUNDATION FOR EINSTEIN'S REVOLUTIONARY INSIGHTS.
TELL US A WORD THAT BEGINS WITH THE LETTER 'R'.
WABBIT...?
THE WORD IS RABBIT. ONCE AGAIN!!
WABBITTT...

HISTORY DOESN'T RECORD THAT MICAEL FARADAY EVER ATTENDED SCHOOL AGAIN. HE WAS SENT TO WORK AT A BOOKBINDERY AT THE AGE OF 13. BY DAY, HE BOUND THE BOOKS, AND BY NIGHT, HE READ THEM. IT WAS THE BEGINNING OF A LIFELONG FASCINATION WITH ***ELECTRICITY***. HIS BIG BREAK CAME WHEN A CUSTOMER GAVE HIM A TICKET TO A SENSATIONAL NEW KIND OF ENTERTAINMENT- ***SCIENCE FOR THE PUBLIC***.



IT STARTED RIGHT HERE AT ***LONDON'S ROYAL INSTUTION.*** AT THAT TIME, ***HUMPHRY DAVY*** WAS NOT ONLY ONE OF THE LEADING SCIENTISTS, HE WAS ALSO A CONSUMMATE SHOWMAN. FARADAY WAS TOO BUSY TAKING NOTES TO APPLAUD. FARADAY CREATED A *TRANSCRIPT OF DAVY'S LECTURE*. MAYBE A GIFT LIKE THAT WOULD GET HIM THE ***GREAT MAN'S ATTENTION***. MAYBE THIS GLESTURE COULD BE HIS MEANS OF ESCAPE TO A MUCH LARGER UNIVERSE.



FOUR LECTURES
being part of a Course on:
The Elements of
CHEMICAL PHILOSOPHY
Delivered by
SIR H. DAVY



AND IT DID. FARADAY JOINED AS A SECRETARY OF DAVY'S LAB. AT THAT TIME, HUMPHRY DAVY AND CHEMIST WILLLIAM WERE EXPERIMENTING WITH A MYSTERIOUS PHENOMENON, ONE WITH POTENTIALLY FAR-REACHING IMPLICATION. THEY WERE TRYING TO SEE WHEN THEY DROVE THE CURRENT THROUGH THE WIRE THE NEEDLE CONTINUOUSLY DEFLECTED AWAY FROM THE WIRE. THAT MEANS, ***ELECTRICITY HAS SOMETHING TO DO WITH MAGNETISM***. UP TO NOW, ELECTRICITY HAS BEEN NOTHING MORE THAN AN ENTERTAINING NOVELTRY TOY. IT COULD MAKE A LIGHT FLASH FOR AN INSTANT OR TURN A COMPASS NEEDLE BRIEFLY, BUT IT HAS NO PRACTICAL APPLICATION.

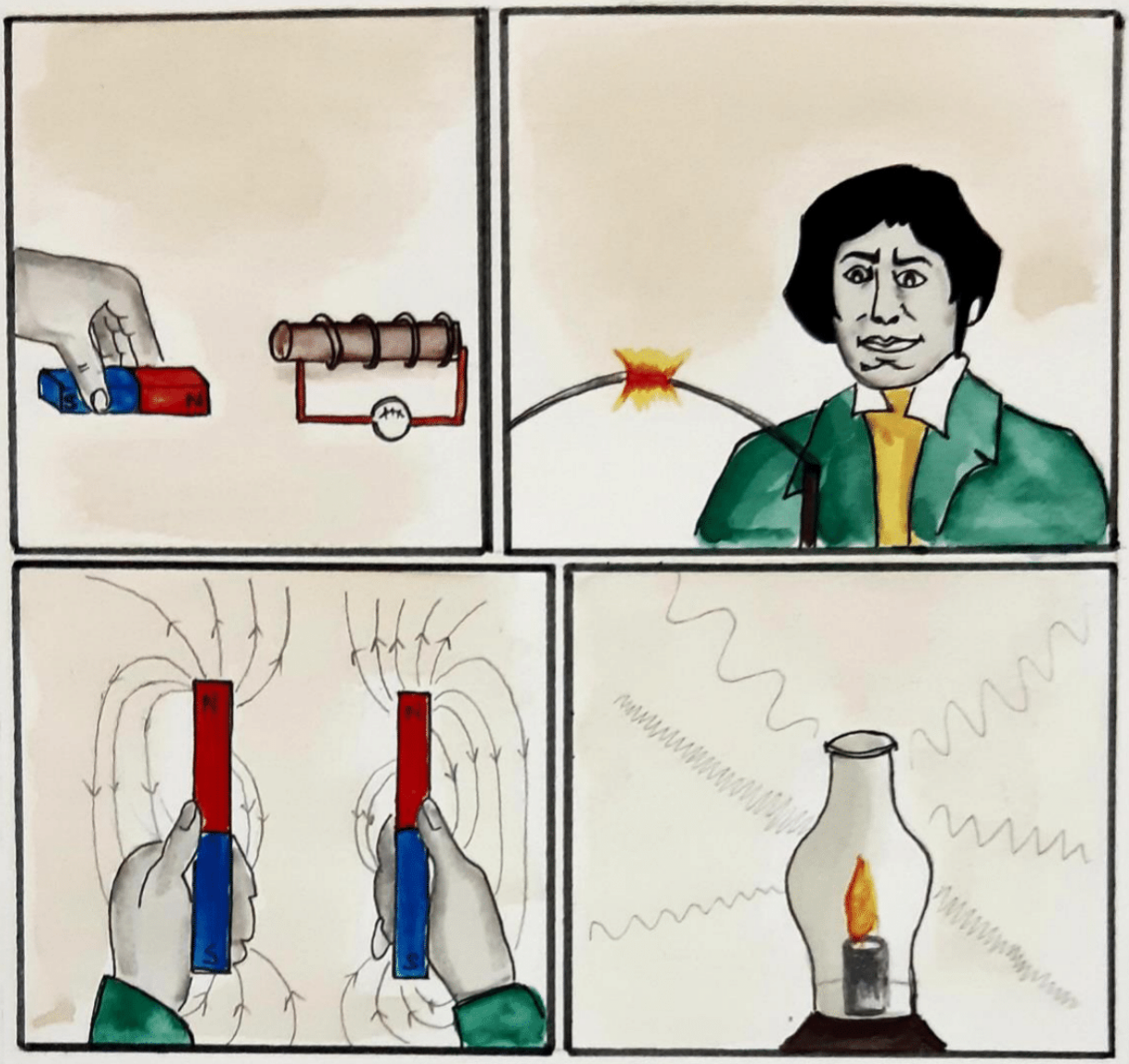



WHY NOT YOU, GEORGIE?
IT GOES!
FARADAY IMMEDIATELY SET ABOUT DESIGNING THE EXPERIMENT, DEVOTING EVERY MOMENT OF HIS SPARE TIME TO THE PROBLEM. HE DID IT. THIS WAS THE FIRST MOTOR CONVERTING ELECTRIC CURRENT TO CONTINUOUS MECHANICAL MOTION. TRY TO IMAGINE ALL THE BUSINESSES, INDUSTRIES, TECHNOLOGIES, AND TRANSFORMATIONS OF THE WAY WE LIVE THAT HAVE THEIR BEGINNINGS IN THAT ECSTATIC MOMENT IN MICHAEL FARADAY'S LABORATORY.

ONE DAY FARADAY WAS SUPPOSED TO WRITE A LETTER TO HIS FRIEND SCHOENBEIN BUT COULDN'T REMEMBER WHAT HE WAS TRYING TO WRITE. WHEN FARADAY WAS 49, HE BEGAN TO BATTLE SEVERE *MEMORY LOSS* AND *DEPRESSION*. HIS WORK CAME TO S STANDSTILL. ALTHOUGH HE NEVER FULLY RECOVERED, HIS GREATEST ACHIEVEMENTS STILL LAY AHEAD. FARADAY HAD IMMERSED HIMSELF SO DEEPLY IN ELECTRICAL AMD MAGNETIC EXPERIMENTS THAT HE CAME TO VISUALIZE THE SPACE AROUND ***A MAGNET AS FILLED WITH INVISIBLE LINES OF FORCE.***



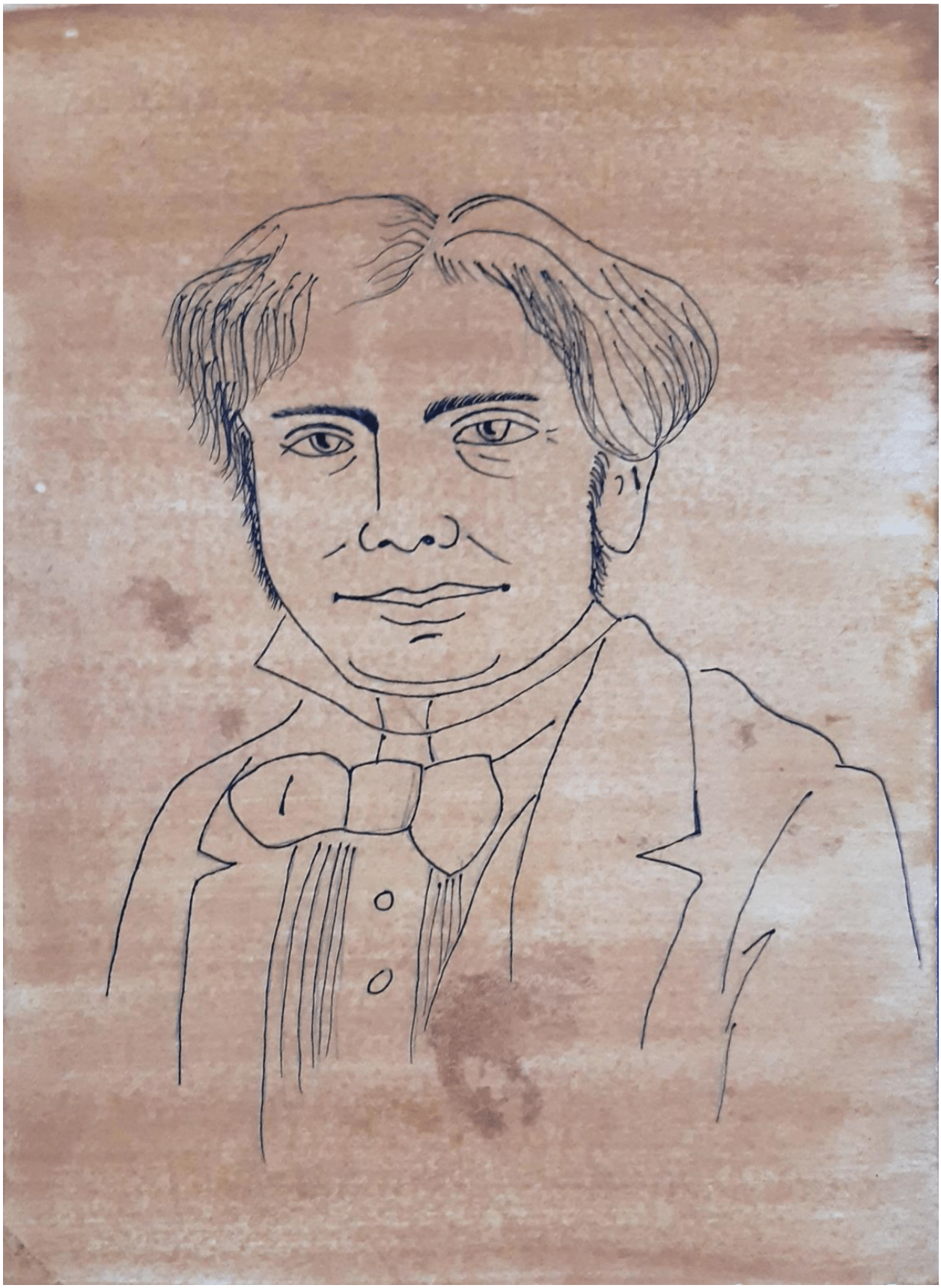


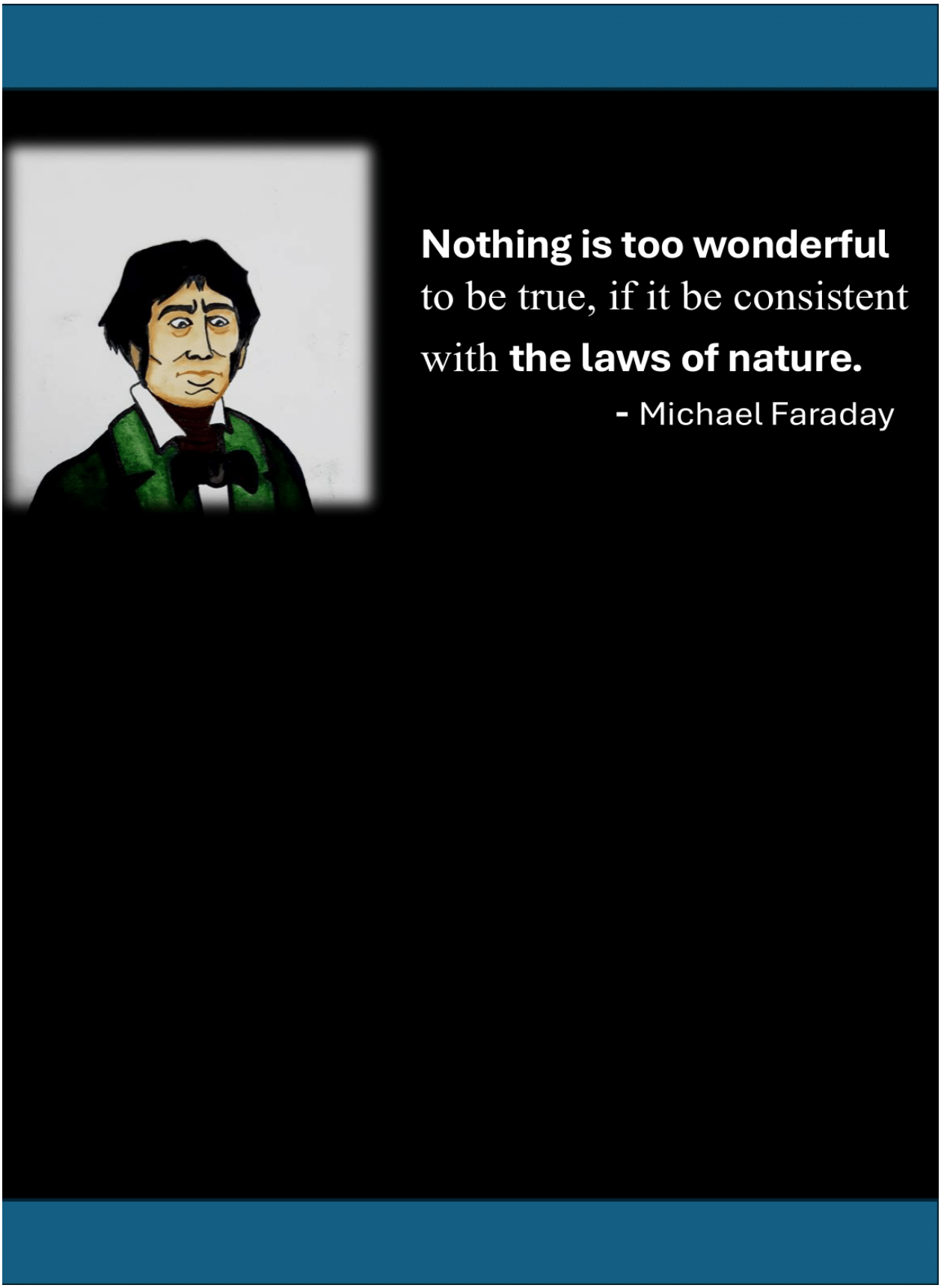


A MAGNET WAS NOT SIMPLY THE MAGNETIZED BAR OF IRON THAT YOU COULD SEE. IT WAS ALSO UNSEEN SOMETHING IN SPACE AROUND THE BAR. AND THAT SOMETHING HE CALLED A FIELD. A MAGNETIC FIELD. FARADAY ALSO EXPERIMENTALLY SHOWED THAT WHEN WE MOVE A BAR OF MAGNET THROUGH A COIL IT CAN INDUCE CURRENT THROUGH IT. TODAY WE KNOW IT AS ***FARADAY'S LAW OF INDUCTION***. NOW, AT 60, DECADES AFTER THE FERTILE PERIOD OF THE GREATEST PHYSICISTS, PLAGUED BY MEMORY LOSS AND MELANCHOLY, HE FEARLESSLY PROBED DEEPER INTO THE MYSTERIOUS INVISIBLE FORCES.



DESPITE HIS DEPRESSION, HE REMAINED AS PASSIONATELY CURIOUS AS EVER. HAVING DEMONSTRATED THE CONNECTIONS BETWEEN ELECTRICITY AND MAGNETISM, HE WONDERED, WERE THESE TWO FORCES ALSO CONNECTED TO A THIRD- ***LIGHT?*** IF HE COULD ONLY SHOW A CONNECTION AMONG THESE *THREE INVISIBLE PHENOMENA*, ONE OF NATURE'S MOST INTIMATE SECRETS WOULD, AT LAST, BE REVEALED. BUT HE COULDN'T DO MATH. FARADAY HAD FINALLY HIT A WALL THAT HE COULD NOT OVERCOME. AND THEN, THE GREATEST THEORETICAL PHYSICIST CAME ALONG- JAMES CLERK MAXWELL. MAXWELL TRANSLATED FARADAY'S EXPERIMENTAL OBSERVATION ON ELECTROMAGNETIC FIELDS INTO EQUATIONS, THIS TWEAKING OF THE EQUATION CHANGED *FARADAY'S STATIC FIELD INTO WAVES THAT SPREAD OUTWARD AT* ***THE SPEED OF LIGHT.***




Nothing is too wonderful
to be true, if it be consistent
with the laws of nature.
- Michael Faraday

ফিরবো বললেই ফেরা যায় নাকি?

অভ্রিম্বেক পাল

ট্রেনে যেতে যেতে জানলা দিয়ে দেখছি রেললাইনের দুধারে কাশবন। কী অপূর্ব সেই দৃশ্য! আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আর নীচে কাশফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে, তার মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল। দেখতে দেখতে প্রায় ১০ বছর কেটে গেল আমি গ্রামের বাড়ি যাইনি। তাই এবছর সব ভাই-বোন, কাকা-জেঠুরা মিলে প্ল্যান করেছে এবারের দুর্গাপূজো সবাই একসাথে গ্রামের বাড়িতে কাটাবে। আজ ষষ্ঠী, ভোর ৫:৫৫-র ট্রেনটা ধরে বেরিয়ে পড়েছি। শরীর খুব ক্লান্ত, গতকাল রাতেই ফ্লাইটে করে IISc বেঙ্গালুরু থেকে ফিরলাম। অনেক অনুরোধ করার পর স্যার এক সপ্তাহের জন্য ছুটি দিয়েছেন। খুব এক্সাইটেড লাগছে। প্রতি বছর কলকাতার ওই থিম পুজো দেখতে দেখতে বোর হয়ে গেছি, এবারের পুজোটা বেশ আলাদা হবে মনে হচ্ছে। বলতে বলতে ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। ট্রেন থেকে নামতেই দেখি ছোটকা দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। তারপর আমরা একসাথে গাড়ি করে আটঘরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে এক ঘণ্টা লাগে গাড়িতে। গ্রাম বাংলার এই অপরূপ সুন্দর চেহারা দেখতে কার না ভালো লাগে। দেখতে দেখতে কখন যে সময় কেটে গেল।

এই হলো আমাদের গ্রামের বাড়ি। তিনতলা একটা বাড়ি, অনেকদিন কোনো দেখাশোনা হয়নি বলে একটু পরিত্যক্তের মতো লাগছে, তবুও এই পুরোনো বাড়ির যে একটা গ্ল্যামার আছে সেটা আলাদা। সবাই আগেই এসেছে, আমরাই লেট। আজকে সন্ধ্যেতেই দুর্গা প্রতিমা আসবে, তারপর বোধন হবে। বাড়িতে ঢুকতেই দেখি ঢাক বাজছে, ঢাকিরাও এসে গেছে। বাঙালির দুর্গাপূজো মানেই মনোমুগ্ধকর ঢাকের আওয়াজ—ইচ্ছে করছিল তখনই নাচতে শুরু করি। আমরা আসব বলে দিদান স্পেশাল বাঙালি খাবার রান্না করে রেখেছেন—লুচি, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, ছোলার ডাল, আলুর দম, ফুলকপির তরকারি, টমেটোর চাটনি, মিষ্টি দই আর আমার খুব প্রিয় পঞ্চাদার দোকানের ল্যাংচা। উফফ কতদিন পর এরকম ভুরিভোজ হলো! যদিও আমাদের IISc-এর বি মেস সারাবছর যথেষ্ট ভালো খাওয়ায়, কিন্তু দিদানের রান্নার কাছে বি মেসও হার মানবে। খাওয়ার পর গল্প। আমার বড় জেঠু আমেরিকার পারডু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, উনি মার্কিনির গল্প বলতে শুরু করলেন। ছোটকা চাকরিসূত্রে ফ্রান্সে, সে তার ফরাসি খাবারের সুখ্যাতি নিয়েই ব্যস্ত। আমার ছোট ভাই-বোনেরা উঠোনে ক্রিকেট খেলছে। আমি মোবাইলটা হাতে নিয়ে একটু গ্রামের পথে একা হাঁটতে বেরোলাম। গ্রামে এসেছি, পুজোতে কিছু অ্যাস্থেটিক পোস্ট করতে হবে তো ইনস্টাগ্রামে! তাই ছবি তুলতেই ব্যস্ত—ধানক্ষেতে চাষিরা লাঙল দিচ্ছে, জলাশয় থেকে জেলেরা মাছ ধরছে, তাঁতিরা শাড়ি বুনছে। এর পরেই মায়ের ফোন—বাড়িতে দুর্গা প্রতিমা আসবে এখনই, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে।

এইমাত্র প্রতিমা এসেছে। বাগবাজারের প্রতিমার সাথে অনেক মিল পেলাম—সেই ডাকের সাজ, একচালা প্রতিমা। জোরে জোরে ঢাক বাজছে আর সবার মুখে হাসি, সবাই আনন্দে নাচছে। আমি বরাবরই বাংলা সিনেমার বড় ভক্ত। স্পটিফাইতে "ঢাকের তালে কোমর দোলে" গানটা চালিয়ে স্পিকারে কানেক্ট করে দিলাম। তারপর নিজেও নাচতে শুরু করলাম। সন্ধ্যার সময় গোটা বাড়ি আলোয় সাজল। দেবীর বোধন শুরু হলো। সবাই নতুন শাড়ি-জামা পরে চলে এসেছে। বোধনের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। আমার মা একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। আরও অনেকে গান, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশন করল। কাল সপ্তমী, ভোর ৫টায় কলাবউ স্নান আছে। তাই আজকে বেশি রাত জাগলে চলবে না। রাত ১০টার মধ্যে ডিনার সেরে শুয়ে পড়লাম।

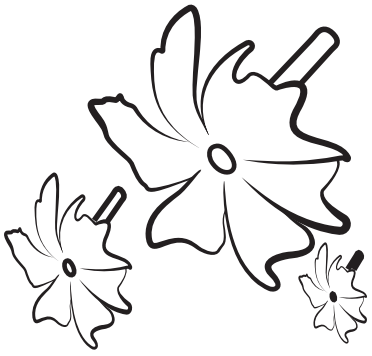
হঠাৎ তীব্র আওয়াজ। বাইরে খুব চিৎকার। কারা যেন ইংরেজিতে গালাগালি করছে। আমি ঘুমচোখে বাইরে বেরিয়ে দেখি দুজন সাহেব মদ খেয়ে মাতলামি করছে। সামনে কয়েকটা বিদেশি গাড়ি আর পিচঢালা রাস্তায় দু'পাশে অনেক বাড়ি। আমি তো গ্রামে ছিলাম, এগুলো কোথা থেকে এল! আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এমনি সময় পাশের ঘর থেকে একজন ছেলে বেরিয়ে এসে বলল, "অভিষেক, আর ইউ অলরাইট?" এ তো হ্যারি, ও এখানে কী করছে! আমি বললাম যে আমি ঠিক আছি। ও বুঝতে পারল আমি ঠিক নেই, তাই আবার একই প্রশ্ন করল। তখন আমি ওকে বললাম যে আমি তো গ্রামে ছিলাম, কিন্তু এখন কোথায়! ও আমাকে বলল আমি স্বপ্ন দেখেছি, কারণ আমি গত ১০ মাস ধরে বার্মিংহামেই আছি। এবার আমি আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারলাম। আমি এতটাই মিস করছি দুর্গাপূজো যে স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেছি। ওই রাত ২:৩০-এই বাড়িতে ফোন করলাম, ওখানে তখন সকাল ৭টা। এই অদ্ভুত সময়ে ফোন করায় মা একটু চিন্তিতই মনে হলো। আমি পুরো ঘটনাটা বললাম। তারা বলল পুজোয় দেশে ফিরে যেতে। আমারও এখানে আর ভালো লাগছিল না—প্রতি বছর পুজোয় কলকাতায় থাকি আর এবছর দেশে নেই।

স্বপ্নের পুরোটা কিন্তু কাল্পনিক ছিল না। একটা জিনিস সত্যি ছিল—আজ সত্যিই ষষ্ঠী। আমি ফ্লাইট চেক করতে বসলাম। খুব এক্সপেন্সিভ, কিন্তু কিছু যায় আসে না, বাড়ি তো আমি ফিরবই। কাল সপ্তমীর জন্য একটা ফ্লাইট বুক করে ফেললাম। আমি খুব খুশি যে পুজোয় অবশেষে কলকাতায় ফিরব। তাড়াতাড়ি একটা ট্রলি প্যাক করে নিলাম। এতটাই এক্সাইটেড যে কাল সকালে ফ্লাইট, কিন্তু আমি আজ রাতেই এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেছি। কোনোভাবেই ফ্লাইট মিস করা চলবে না।

ট্রেনে যেতে যেতে জানলা দিয়ে দেখছি রেললাইনের দুধারে কাশবন। কী অপূর্ব সেই দৃশ্য! আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আর নীচে কাশফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে, তার মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল। দেখতে দেখতে প্রায় ১০ বছর কেটে গেল আমি গ্রামের বাড়ি যাইনি। তাই এবছর সব ভাই-বোন, কাকা-জেঠুরা মিলে প্ল্যান করেছে এবারের দুর্গাপূজো সবাই একসাথে গ্রামের বাড়িতে কাটাবে। আজ ষষ্ঠী, ভোর ৫:৫৫-র ট্রেনটা ধরে বেরিয়ে পড়েছি। শরীর খুব ক্লান্ত, গতকাল রাতেই ফ্লাইটে করে IISc বেঙ্গালুরু থেকে ফিরলাম। অনেক অনুরোধ করার পর স্যার এক সপ্তাহের জন্য ছুটি দিয়েছেন। খুব এক্সাইটেড লাগছে। প্রতি বছর কলকাতার ওই থিম পুজো দেখতে দেখতে বোর হয়ে গেছি, এবারের পুজোটা বেশ আলাদা হবে মনে হচ্ছে। বলতে বলতে ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। ট্রেন থেকে নামতেই দেখি ছোটকা দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। তারপর আমরা একসাথে গাড়ি করে আটঘরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে এক ঘণ্টা লাগে গাড়িতে। গ্রাম বাংলার এই অপরূপ সুন্দর চেহারা দেখতে কার না ভালো লাগে। দেখতে দেখতে কখন যে সময় কেটে গেল।

এই হলো আমাদের গ্রামের বাড়ি। তিনতলা একটা বাড়ি, অনেকদিন কোনো দেখাশোনা হয়নি বলে একটু পরিত্যক্তের মতো লাগছে, তবুও এই পুরোনো বাড়ির যে একটা গ্ল্যামার আছে সেটা আলাদা। সবাই আগেই এসেছে, আমরাই লেট। আজকে সন্ধ্যেতেই দুর্গা প্রতিমা আসবে, তারপর বোধন হবে। বাড়িতে ঢুকতেই দেখি ঢাক বাজছে, ঢাকিরাও এসে গেছে। বাঙালির দুর্গাপূজো মানেই মনোমুগ্ধকর ঢাকের আওয়াজ—ইচ্ছে করছিল তখনই নাচতে শুরু করি। আমরা আসব বলে দিদান স্পেশাল বাঙালি খাবার রান্না করে রেখেছেন—লুচি, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, ছোলার ডাল, আলুর দম, ফুলকপির তরকারি, টমেটোর চাটনি, মিষ্টি দই আর আমার খুব প্রিয় পঞ্চাদার দোকানের ল্যাংচা। উফফ কতদিন পর এরকম ভুরিভোজ হলো! যদিও আমাদের IISc-এর বি মেস সারাবছর যথেষ্ট ভালো খাওয়ায়, কিন্তু দিদানের রান্নার কাছে বি মেসও হার মানবে। খাওয়ার পর গল্প। আমার বড় জেঠু আমেরিকার পারডু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, উনি মার্কিনির গল্প বলতে শুরু করলেন। ছোটকা চাকরিসূত্রে ফ্রান্সে, সে তার ফরাসি খাবারের সুখ্যাতি নিয়েই ব্যস্ত। আমার ছোট ভাই-বোনেরা উঠোনে ক্রিকেট খেলছে। আমি মোবাইলটা হাতে নিয়ে একটু গ্রামের পথে একা হাঁটতে বেরোলাম। গ্রামে এসেছি, পুজোতে কিছু অ্যাস্থেটিক পোস্ট করতে হবে তো ইনস্টাগ্রামে! তাই ছবি তুলতেই ব্যস্ত—ধানক্ষেতে চাষিরা লাঙল দিচ্ছে, জলাশয় থেকে জেলেরা মাছ ধরছে, তাঁতিরা শাড়ি বুনছে। এর পরেই মায়ের ফোন—বাড়িতে দুর্গা প্রতিমা আসবে এখনই, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে।

এইমাত্র প্রতিমা এসেছে। বাগবাজারের প্রতিমার সাথে অনেক মিল পেলাম—সেই ডাকের সাজ, একচালা প্রতিমা। জোরে জোরে ঢাক বাজছে আর সবার মুখে হাসি, সবাই আনন্দে নাচছে। আমি বরাবরই বাংলা সিনেমার বড় ভক্ত। স্পটিফাইতে "ঢাকের তালে কোমর দোলে" গানটা চালিয়ে স্পিকারে কানেক্ট করে দিলাম। তারপর নিজেও নাচতে শুরু করলাম। সন্ধ্যার সময় গোটা বাড়ি আলোয় সাজল। দেবীর বোধন শুরু হলো। সবাই নতুন শাড়ি-জামা পরে চলে এসেছে। বোধনের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। আমার মা একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। আরও অনেকে গান, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশন করল। কাল সপ্তমী, ভোর ৫টায় কলাবউ স্নান আছে।



Her Eyes in the War

Manas Kundu

Have you seen her in the war?
No! You cannot. She isn't to be seen.
But when her gaze collides with mine,
Oh God, the silence is unbearable,
Her eyes speak a language
I was never meant to read.

I have drowned in their blackness,
Too deep to swim,
Too sweet to escape.
Each time she draws closer,
My breath deserts me.

Her homeless hair falls
Like shadows across her cheeks
I pray you never witness it.
Her fragrance lingers,
Born of no flower, no season,
Only her.

Her fingertips narrate stories
The world will never hear.
I alone am the listener
And I wish to remain so.

Yes, I met my lady in the war,
Where fruit ripens on the blood of men,
Where pure souls are driven out
In the name of God,
Where freedom is bartered
To the butcher's hand.

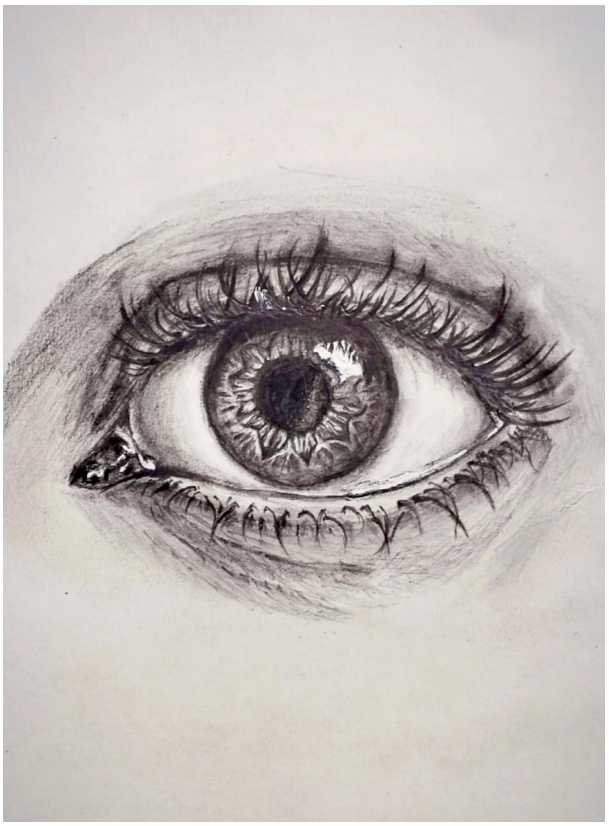
Still, I long to meet her there,
Again and again.
Even if bullets render me transparent,
Even if my body is buried
In the valley of snow,
I will keep my eyes open
Only to see her once more.

And if not in this life,
Then a million years hence
Perhaps in a parallel universe.
But I will meet her,
Again and again.

कंटक

चिरन्तन (शाश्वत)

एक फूल मैं लाया तेरी खातिर,
कुछ काँटे थे उसकी डाली में।
मैं काँटों को चुन निकाला तो,
कुछ चुभे मेरे हथेली में।
दर्द हुआ, ज़ख़्म भी मिले...
मैं रंगा ख़ून से लाली रे।
पर देखी जब आँखें तेरी
मैं बन बैठा मतवाली रे।
ना ज़ख़्म की परवाह हुई मुझे
ना दर्द हुआ कोई शूली से।
हर दर्द वारे, हर ज़ख़्म सिए,
तेरी अमृत जैसी बोली से।



সায়ক মাজি



তীর্থেন্দু বণিক



মন্দিশা দে



সুমেধা চৌধুরি

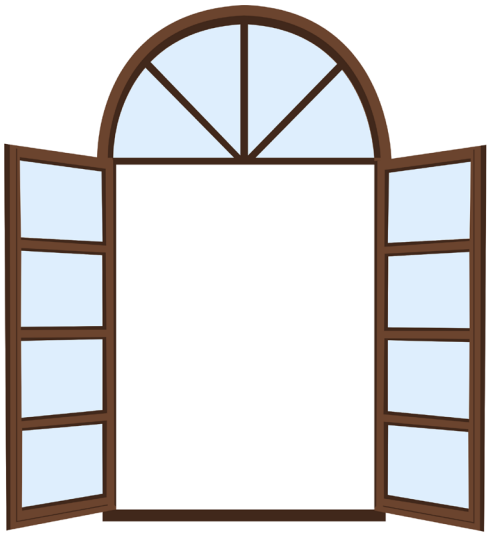
বেদুইন

শ্রেয়ম মাইতি

তোমায় দেখি চোখের কাছে যেদিন,
মনবাক্সে লুকিয়ে রাখি কথা –
শেষ শব্দে কবিতা বেদুইন,
জামার খুঁটে তোমার আঁচল বাঁধা।

সারাটাদিন এদিকওদিক করি,
গলার কাছে আটকে থাকে শ্বাস –
"কী হয়েছে বল না আমায় বুড়ি?"
প্রশ্ন আসে, উত্তর ইতিহাস।

এমন সময় আবার তুমি এলে,
ভাবছি এবার বলেই ফেলি আমি –
ঝোড়ো হাওয়ায় জাহাজের পাল তুলে,
নাহয় হলাম একটুকু বদনামি।





শ্রেয়া বসুরায়

নিশির ডাক

রোহিত দত্ত

চরিত্র

মাধব: বসু বাড়ির একমাত্র ছেলে

নেত্রা: মাধবের হবু স্ত্রী

নীলাঞ্জন: মাধবের বাবা

অভিলাষ: মাধবের কাকা

অঞ্জলি: মাধবের মা

কাহিনি: মাধবের ছোট বেলার বন্ধু

মদন: মাধবের ছোট বেলার বন্ধু

দিব্য: মাধবের ছোট বেলার বন্ধু

নিশি: গ্রামের মেয়ে

উপেন: বসু বাড়ির বিশিষ্ট কর্মচারী

ঠাকুমা: মাধবের ঠাকুমা

মূর্তি

দৃশ্য ১

[মঞ্চ অন্ধকার। ভয়েসওভার]

ছোট মাধব: ঠাম্মি, আমাদেরই বাড়ির দুর্গা ঠাকুর। আমরা কেন যাই না বিসর্জন দিতে?

ঠাকুমা: ঠাকুরের ভাসান দেখতে নেই তো। তাই জন্য আমরা যাই না।

ছোট মাধব: কিন্তু আনন্দ কাকু রা তো যায়।

ঠাকুমা: আনন্দ কাকু রা তো বড়। আনন্দ কাকু দের কিছু হবে না। কিন্তু তুমি তো আমার ছোট গোপাল। তোমাকে যদি পুকুরের মাছ ঘোপ করে ধরে নিয়ে যায়? তোমার ঠাম্মি কাকে রাতে গল্প শোনাবে?

ছোট মাধব: কিন্তু ঠাম্মি...

ঠাকুমা: আর কোন কিন্তু না। এবার অনেক রাত হল। ঘুমিয়ে পড়ো। কাল উঠতে না পারলে কিন্তু মায়ের বরণ দেখতে পাবে না। ঘুমাও ঘুমাও।

অঞ্জলি: মা, মাধব তো এখন বড় হয়ে গেছে। ওকে সত্যি টা বলে দিলে হয় না?

ঠাকুমা: না বৌমা। ওকে কিছু বলার দরকার নেই। কাল পুজোটা ভালই ভালই কেটে যাক আর তোমরা মুম্বাই ফিরে যাও। ও যখন বড় হবে তখন না হয় দেখা যাবে।

[শঙ্খ ধ্বনি, উল্লু ধ্বনি, ঢাকের আওয়াজ, "বলো দুর্গা মাই কি জয়", মূর্তি জলে পড়ার আওয়াজ, প্লেন টেক অফের আওয়াজ]

দৃশ্য ২

[মঞ্চ আলোকিত। মঞ্চে দেবী প্রতিমা। মাধব ও উপেন মঞ্চে]

মাধব: উপেন এই নে। এই লিস্টটা ধরে সব নিয়ে আয়। আচ্ছা শোন, আনন্দ কাকুর দোকান থেকে আনিস। বলিস আমি বিকালের দিকে গিয়ে টাকা দিয়ে দেবো।

উপেন: ঠিক আছে। দিদির জন্য কি কিছু আনবো?

মাধব: ও কিছু তো বলে নি। তুই যা। ওর কিছু লাগলে আমি নিয়ে নেবো।

উপেন: ঠিক আছে।

[উপেন বেরিয়ে যায়। নেত্রার প্রবেশ]

নেত্রা: ম্যাডি। মাই কাইসি লাগ রহি হু?

মাধব: উপেন আমাকে একটু জল দে রে... আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। মুম্বাই এর মারাঠি মুলগি, এরম বাংলার মামুনি হয়ে উঠতে পারে... আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

নেত্রা: ধ্যাত। হামেশা মজাক।

মাধব: না রে নেত্রা। [মদনের প্রবেশ] মা কে জানে কে বাদ তুমনে জিস তরহ সে মুঝে সম্ভালা হ্যায়, আই ডোন্ট থিঙ্ক আই ক্যান এভার থ্যাঙ্ক ইউ এনাফ।

মদন: চাপ নিস না ভাই। তুই আমাকে থ্যাঙ্কস করে দিস।

মাধব: আরে মদন। আয় আয়।

মদন: নমস্তে ভাবী। [কাহিনির প্রবেশ] আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

নেত্রা: না না মদন ভাইয়া। কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

কাহিনি: হলেও ও তোকে বলবে কেন? নেত্রা তোমার কোন কিছু লাগলে তুমি আমাকে বলবে। এই বাঁদর দুটা কোন কাজের না। তুমি আমাকে বলো।

মদন: কেনো রে? তুই এমন কোন হনু?

কাহিনি: এই। হনু বলবি না।

মাধব: আচ্ছা আচ্ছা, হয়ে গেছে। তোরা কি পুজোর মধ্যেও ঝগড়া করবি?

কাহিনি: ওকে বল না। ওই তো শুরু করতো।

মদন: আমি করতাম? আমি করতাম?

কাহিনি: একদম নিজের নামের মতনই... মদন।

নেত্রা: কাহিনী, তুমি তো বললে না। কাইসি লাগ রহি হু মাই?

মদন: সত্যি বলবো? তোমাকে কিন্তু হেব্বি লাগছে এই লুকে।

কাহিনি: তোকে জিগ্যেস করছে? বাঁদর। খুব মিষ্টি লাগছে তোমায়।

মদন: বেরোই তাহলে?

মাধব: দিব্য?

মদন: ও বললো দোকানে আছে। বেরোনোর সময় call করতে।

মাধব: আচ্ছা, আমি তাহলে গাড়ির চাবিটা নিয়ে আসি। নেত্রা, তোমার পার্সটা আনবো?

নেত্রা: মাই চলতি হু তোমহারে সাথে, চালো। [নেত্রা ও মাধব বেরিয়ে যায়]

কাহিনি: তুই সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ঝগড়া করিস কেন বলতো?

মদন: কারণ তোর রাগি মুখটা খুব মিষ্টি।

কাহিনি: সারাক্ষণ মশকরা। [উপেনের প্রবেশ] আজ তো নবমী হয়ে গেলো। কাল দশমী। মাধব কে কি সব বলে দেওয়া উচিত?

উপেন: না দিদি। সেটা ঠিক হবে না। ঠাম্মি মারা যাওয়ার আগে পইপই করে বলে গেছেন মাধব দাকে যেনো কিছু না বলা হয়। দাদা কে এই সব থেকে দূরে রাখার জন্যই নীলাঞ্জন কাকু ওদের নিয়ে মুম্বাই চলে যান।

কাহিনি: কিন্তু এই বছর কি করবো? ঠাম্মি ও নেই। কাকু কাকিমা ও নেই। এত বছর ওনারা ওকে এই বাড়ির পুজোর থেকে দূরে রেখেছে। কিন্তু এই বছর ওকে কি ভাবে সরিয়ে রাখবে?

মদন: নেত্রা কে সব বলে দি না। নেত্রা ওকে ঠিক সরিয়ে রাখতে পারবে।

[মাধব ও নেত্রার প্রবেশ]

মাধব: কাকে সরিয়ে রাখছিস? আবার কিছু প্ল্যান করছিস নাকি?

মদন: আরে কিছু না। তুই চল। আবার ফিরতে হবে তো সন্ধ্যের মধ্যে।

মাধব: চল চল। উপেন জিনিসগুলো নিয়ে এসেছিস তো? কেউ এলে মিষ্টি-টিষ্টি দিস। আমরা আরতি'র আগেই চলে আসবো। ঠাকুর মশাই এলে ওনাকে চা জল দিস। চল।

[সবাই বেরিয়ে যায়]

উপেন: রক্ষা করো মা। এই বসু বাড়ি আর দাদা কে দেখে রাখো মা।

[উপেন ঠাকুর নমস্কার করে বেরিয়ে যায়। মঞ্চ খালি। একটা হালকা গলার আওয়াজ বেজে ওঠে: রাখবো, উপেন দা। তোমাদের দাদা কে আমি দেখে রাখবো।]

দৃশ্য ৩

[মঞ্চ অন্ধকার। মঞ্চের উপর একটা মেয়ে ঠাকুরের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে আছে। মাধবের প্রবেশ।]

মাধব: একি। তুমি? তুমি কে? আর এত রাতে ঠাকুর দালানে কি করছ?

নিশি: আমার নাম নিশি। আপনাদের বাড়ির ঠাকুর খুব জাগ্রত শুনেছি তাই দেখতে এলাম। দেখি ঠাকুর আমার প্রার্থনা শোনে কি না।

মাধব: কিন্তু তুমি ভিতরে এলে কি করে? দরজা কে খুললো? উপেন? এই উপেন।

মাধব: এরম ভাবে মাঝ রাতে কারুর বাড়ি যেতে নেই জানো

নিশি: কিন্তু আমি তো এখানেই থাকি দাদা।

মাধব: এইখানে? মানে তুমি এই গ্রামেরই মেয়ে? কার মেয়ে? তোমাকে তো আগে দেখিনি।

নিশি: তুমি তো এখানে থাক না। তাই দেখোনি। আমি পেছনের পুকুর পাড়ে থাকি। প্রতি বছর আসি ঠাকুর নমস্কার করতে। কিন্তু এইবার...

মাধব: এইবার?

নিশি: এইবার শুধু ঠাকুর দেখতে আসি নি। তুমি এত বছর পরে ফিরেছ শুনে, তোমাকে দেখতে এলাম। শেষ তোমাকে সেই পনেরো বছর আগে দেখেছিলাম।

মাধব: এই তুমি কে বলতো? কিরম সব আজব কথা বলছ! তুমি নিজেই তো আঠারো উনিশের বেশি হবে না। তোমার পনেরো বছর পুরোনো কথা মনে আছে?

নিশি: আমার সব মনে আছে দাদা। ওই সব কথা ভোলা যায়?

মাধব: ঠিক করে বলতো তুমি কে।

নিশি: আমি নিশি। পুকুর পাড়ে থাকি।

মাধব: পুকুর পাড়... মানে টুবাই কাকুর বাড়ি? তুমি কি টুবাই কাকুর মেয়ে?

নিশি: না।

মাধব: তাহলে? [নিশি একটা আজব হাসি দিয়ে তার দিকে তাকায়] সে তুমি যেই হও না, এখন বাড়ি যাও। এতো রাতে অন্যের বাড়ি যেতে নেই। আমি উপেন কে বলছি তোমাকে ছেড়ে দিতে। উপেন...

নিশি: আমি কোথায় যাব, দাদা? আমার তো আর কোথায় যাওয়ার জায়গা নেই। পুকুর পাড়টা ছাড়া যে আমি আর কোথাও যেতে পারি না।

[নেত্রার প্রবেশ]

নেত্রা: ম্যাডি, ক্যা হুয়া? এখানে কী করছো?

মাধব: এই দেখো। কিরম আজব একটা মেয়ে ভিতরে ঢুকে এসেছে।

নেত্রা: কোন মেয়ে?

মাধব: আরে এই মেয়ে... কোথায় গেল? এখনি তো এখানে ছিল।

নেত্রা: তুমি বোধহয় ভুল দেখেছো কিছু। পার তুম এখানে কী করছো?

মাধব: [হেসে] তুমি বাংলা বললে এতো মিষ্টি লাগে না। যাই হোক চলো শুয়ে পড়ি।

নেত্রা: পর তুম এখানে আয়ে কিউ থে?

মাধব: চেক করনে কি দিয়ে মে তেল হাইন বা নাহি।

[উপেনের প্রবেশ]

উপেন: ডাকলে মাধব দা?

মাধব: হ্যাঁ, একটা আজব মেয়ে ঢুকে এসেছিল। তুই দরজা গুলো ঠিক করে বন্ধ করিস নি? গিয়ে মেইন দরজা টা ঠিক করে লক করে আয়।

উপেন: আমি তো সব ঠিক করেই লক করে ছিলাম। আমি তো কাউকে আসতে দেখি নি।

মাধব: ছাড়। আজব মেয়েটা ছিল। জাগিয়ে চলে গেছে। ওই নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তুই তাও একবার দরজাটা দেখে নিস। নেত্রা, চলো।

নেত্রা: চালো। ওয়েসে বহত লাড়কিয়ো কো নটিস কর রহে হো আজকাল।

মাধব: কেলো করেছে! না মা আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখি না।

নেত্রা: গুড!

মাধব: আচ্ছা তুমি চলো। আমি আসছি। [নেত্রা বেরিয়ে যায়] এই উপেন। পুকুরের ওই পাড়ের বাড়ি টা টুবাই কাকা'র না?

উপেন: হ্যাঁ।

মাধব: ওনার কি কোন মেয়ে আছে?

উপেন: না তো। ওনার তো একটা ছেলে। অখিলেশ।

মাধব: তাহলে ও ছিল টা কে?

উপেন: কে দাদা?

মাধব: ওই মেয়ে টা। কিরম আজব কথাবার্তা। বলে পুকুর পাড়ে থাকে। নামটাও কিরম যেনো একটা। সুন্দর কিন্তু আজব। নিশি। যাই হোক, তুই দরজাটা চেক করে ঘুমিয়ে পড়িস। কাল সকালে উঠে দশমী পুজোর ব্যবস্থা করতে হবে। [মাধব বেরিয়ে যায়]

উপেন: নিশি।

[বাইরে ঝড়ের আওয়াজ। মঞ্চের আলো নিভে যায়]

দৃশ্য ৪

[মঞ্চে আলো। উপেন বসে পুজোর যোগাড় করছে। মদন ও দিব্যের প্রবেশ]

মদন: কিরে উপেন? তোর দাদার দেখা নেই কেন? এখনও ঘুমাচ্ছে নাকি?

উপেন: না না। দাদা ঘরে। রেডি হচ্ছে। দিব্যদা, মদনদা, তোমাদের সঙ্গে একটু কথা ছিল। দাদার সামনে বলা যাবে না।

দিব্য: এমন কী কথা?

উপেন: নিশি।

মদন: এই, চুপ। জানিস না! এই নাম না এই বাড়িতে নেওয়া বারণ।

দিব্য: দাঁড়া মদন। তুই বল উপেন। কী হয়েছে? হঠাৎ ওর কথা তুললি কেন?

উপেন: কাল রাতে দাদার নাকি এই ঠাকুর দালানে একটা মেয়েকে দেখেছে। কথাও বলেছে। মেয়েটা নাকি নিজের নাম বলেছে নিশি।

মদন: এটা কখনো হতে পারে? ও নিশ্চয়ই ভুল কিছু শুনেছে। নিশি কী করে হবে?

দিব্য: আরে অন্য কেউ তো হতে পারে। পৃথিবীতে তো আর একটা নিশি নেই। শোন উপেন, তুই মাধব কে কিছু বলবি না। ও যদি নিশির কথা জিগ্যেস করে, বলবি গ্রামের মেয়ে। ঘুরতে ফিরতে ঢুকে এসেছিল। ঠিক আছে? যা তুই। [উপেন বেরিয়ে যায়] আর তুই মদন। মদন এর কাজ করলে কিন্তু খুব কেলানি খাবি।

মদন: কিন্তু তোর কি মনে হয় না, বৌদি কে এই গুলো বলা উচিত?

দিব্য: হুমম... কাহিনির সঙ্গে কথা বলি। ও নেত্রা কে বুঝিয়ে বলতে পারবে। কিন্তু ও কোথায়?

মদন: বাড়িতে। বললো কী কাজ সেরে আসছে। নিশ্চয়ই সাজতে টাইম লাগছে।

দিব্য: ওর বাড়ি চল। ওখানেই ওর সঙ্গে কথা বলবো।

[নেত্রার প্রবেশ]

নেত্রা: আরে, দিব্য ভাইয়া, মদন ভাইয়া। নমস্তে। কোথায় যাচ্ছো?

দিব্য: নমস্কার বৌদি। আমরা একটু কাহিনির বাড়ি যাচ্ছি। ওর কী কাজে হেল্প লাগবে তাই কল করেছিলো।

নেত্রা: ম্যাডি সে তো মিল কে যাও। ওহ আতা হি হবে।

দিব্য: না বৌদি। আগে ওকে নিয়ে আসি। না হলে ও সারাদিন লাগবে সাজতে। এখানেই তো আসবো। এসে দেখা করছি। [দিব্য ও মদন বেরিয়ে যায়]

নেত্রা: আরে... ছোড়ো।

[নেত্রা পুজোর কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। নিশির প্রবেশ]

নিশি: ও, তুমি তাহলে নেত্রা? বসু বাড়ির হবু বৌমা।

নেত্রা: জী নমস্তে।

নিশি: নিশি, নেত্রা। আমাদের দুজনের নাম শুনে মনে হয় দুই বোন। একই রকম নাম। কিন্তু কপাল কতটা আলাদা। একজন বসু বাড়ির ভিতরে বসে রাজ করবে, আরেকজন বাড়ির বাইরে পরে থাকবে।

নেত্রা: জী, মেইন কুছ সমঝি নাহি। আপন কউন?

নিশি: আমি নিশি। মাধব চেনে আমায়।

নেত্রা: আপনি ম্যাডির বন্ধু?

নিশি: বন্ধু কি না জানিনা। তুমি বরণডালা সাজাচ্ছ?

নেত্রা: হ্যাঁ। আজ দশেরা হ্যায় না... ধ্যাত। বিজয়া দশমী। ম্যাডির কাস্টমসগুলো একটু তো শিখতে হবে। কাহিনীদি হেল্প করে দেবে।

নিশি: এই সিন্দুর তোমার সিঁথিতে উঠবে?

নেত্রা: মানে?

নিশি: এই সিন্দুর তোমার সিঁথিতে উঠবে? সোহাগী হবে তুমি? নাকি আমার মতন পড়া কপাল নিয়ে কাঁদবে?

নেত্রা: ইয়ে আপ কয়া আনাপ শনাপ বল রহি হ্যায়। অউর আপনি কো কিসনে অন্দর আনে দিছে? গেস্টস কা এখানে আনা অ্যালাউড নাহি হ্যায়। আপনি ওহা জাকে বৈঠিয়ে। এখানে সির্ফ ফ্যামিলি মেম্বারস আয়া সাকতে হ্যায়।

নিশি: এবার তুই আমায় বলবি আমি কোথায় আসতে পারি, কোথায় পারি না? দু দিনের মেয়ে, তুই আমায় শেখাবি?

নেত্রা: দেখিয়ে...

[ভিতর থেকে কাহিনির গলা: বৌদি

কাহিনির প্রবেশ]

নেত্রা: ইয়ে কহা গয়ি?

কাহিনি: কি হল নেত্রা, তুমি কাকে খুঁজছ? মাধব কে নাকি?

নেত্রা: এক লাড়কি থি। ইয়াহি খাড়ি থি। কয়া সব উটপটাং কথা বল রহি থি। ম্যাডি কে নিয়ে বলছিলো। তুমি এলে আর ও যে কোথায় চলে গেলো...

কাহিনি: মেয়ে? কোন মেয়ে? আমি তো কোনো মেয়ে কে দেখি নি। তুমি তো একলাই দাঁড়িয়ে ছিলে।

নেত্রা: ছিলো ছিলো। ইয়াহি পর।

কাহিনি: ও কি তোমায় নিজের নাম টা বলেছিলো?

নেত্রা: কি একটা বললো বেশ। হ্যাঁ... নিশি।

কাহিনি: তুমি এখনই আমার সঙ্গে চলো। তোমার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে।

নেত্রা: আরে কাহিনীদি, মুঝে এখানে কাম হ্যায়। তুমি এখানেই বলো না।

কাহিনি: না। এখানে বলা যাবে না। মাধবের উপর বিশাল বড় একটা বিপদ আসতে চলেছে। তুমি চলো আমার সাথে।

নেত্রা: পর কাঁহা?

কাহিনি: গুরুদেব এর কাছে। এবার যা করার গুরুদেবই করতে পারবে। একমাত্র উনি তোমাকে বাঁচাতে পারবেন।

[কাহিনি ও নেত্রা বেরিয়ে যায়। মঞ্চের আলো নিভে যায়]

দৃশ্য ৫

[মঞ্চের আলো জ্বলে ওঠে। মাধবের প্রবেশ]

মাধব: নেত্রা, কই গেলে? নেত্রা? কোথায় গেল সবাই? উপেন? এই উপেন।

নিশি: আমাকে বলো মাধব। কী লাগবে তোমার?

মাধব: কে?!! ভারি আজব মেয়ে তো তুমি। যেখান সেখান থেকে চলে আসো।

নিশি: নেত্রা তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। তাই আমি দিলাম।

মাধব: মানে? এই যাও। যাও তুমি এই বাড়ি থেকে। তুমি এই বাড়িতে আসবে না। যাও।

নিশি: কেনো মাধব। আমি গ্রামের মেয়ে বলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না? আমি যদি নেত্রার মতন মুম্বাই এর মেয়ে হতাম, তুমি আমায় মেনে নিতে?

মাধব: এই ছাড়ো। ছাড়ো আমায়। একদম এই সব করবে না। না হলে কিন্তু আমি পুলিশ ডাকবো।

নিশি: আমায় পুলিশ কি করবে? আমায় ওরা আটকাতে পারবে, মাধব?

মাধব: একদম আমার কাছেই আসবে না। তুমি কে বলো তো? টুবাই কাকুর মেয়ে তো তুমি না? তাহলে কাল রাতে মিথ্যে বললে কেন?

নিশি: তুমি আমায় চিনতে পারছ না, মাধব? চিনবেই বা কি করে। তোমায় যে সবাই আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। আমার সঙ্গে চলো না মাধব। আমি খুব একা। তুমি সঙ্গে চলো না। আজ তো দশমী। আজই তো তোমার আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা। চলো না মাধব।

মাধব: এই এই দূরে যাও। একদম আমার কাছেই আসবে না... নেত্রা... উপেন...

[উপেন ছুটে ঢোকে। নিশি বেরিয়ে যায়]

উপেন: কী ... কী হল দাদা। তোমার এরম অবস্থা কেন? কী হয়েছে?

মাধব: এই তুই কোথায় থাকিস বল তো? ওই মেয়ে টা আবার এসেছিল। কী সব বলছিল আমায়, আমার সঙ্গে ছিল। ওকে ঢুকতে দিল কে? তুই কোথায় ছিলিস?

[দিব্য, মদন ও কাহিনি ও নেত্রার প্রবেশ]

নেত্রা: ম্যাডি... ম্যাডি... ক্যায়া হুয়া তোমহে?

মাধব: নিশি। ওই কাল রাতের মেয়েটা আবার ঘরে ঢুকে এসেছিল। ও আমাদের বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে। ওকে খুঁজে বার করতে হবে।

কাহিনি: তুই কিছু ভুল শুনেছিস, মাধব। নিশি হতেই পারে না। নিশি কি করে হবে?

মাধব: আমি ভুল শুনিনি। ওই মেয়েই। ওই নিশি মেয়েই ছিল।

দিব্য: নিশি হতে পারে না, মাধব। তুই ভুল শুনেছিস।

মাধব: ও নিশি ছিল। আমি ভুল শুনিনি।

দিব্য: নিশি হতে পারে না, মাধব।

মাধব: কেন?

মদন: কারণ নিশি মারা গেছে, মাধব। ৮০ বছর হয়ে গেছে নিশি মারা গেছে।

মাধব: কী?

মদন: উপেন তুই বলবি না আমি?

মাধব: ও কী বলবে? তুই বল।

মদন: উপেন?

উপেন: দাদা ঠিক বলছে, মাধব দা। নিশি মারা গেছে। ৮০ বছর আগে।

মাধব: কিন্তু... ওই মেয়ে টা...

উপেন: তোমার ঠাকুরদা তখন থাকতো এই বাড়িতে। সেই বারও দুর্গা পুজো ছিল। দশমীর বিকেল। মায়ের বরণ হয়ে গেছে। মায়ের ভাসানের পালা। সব ঠিক ছিল। মায়ের প্রতিমাটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পুকুর পাড়ে। কিন্তু কে জানতো, একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে। মা কে জলে দেওয়ার সময়, মায়ের প্রতিমার তলায় চলে আসে আমার ঠাকুরদার ছোট ভাই কালীপ্রসাদ। কেউ কিছু বোঝার আগেই ঘটনা টা ঘটে যায়। পরে যখন কালী দাদুর শরীর পুকুরের থেকে উদ্ধার করা হয়, জানা যায় যে মূর্তি জলে পড়ার সময় কালী দাদুর মাথায় চোট লাগে। ডাক্তার এর ধারণা ছিল, তাতেই দাদু অজ্ঞান হয়ে ডুবে যায়। নিশি ছিলেন কালী দাদুর স্ত্রী। এক বছরও হয়নি বিয়ের, দাদু চলে গেলেন। শুনেছি নিশি দিদা বসু বাড়ি কে দায়ি মনে করতেন এর জন্য। ধাক্কা না নিতে পেরে, দিদা নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, ওই পুকুরেই ঝাঁপ দিয়ে। পরে ওনার ঘরে একটা কাগজ পাওয়া যায় যেখানে উনি লিখেছিলেন, "ওদের কাউকে ছাড়বো না। ওদের সবাইকে সাথে নিয়ে যাব।" তারপর থেকে ঘনিয়ে আসে এই বসু বাড়ির উপর অভিশাপের মেঘ। প্রত্যেক বছর এই বাড়ির কেও না কেও দশমীর দিন ওই পুকুরে ডুবে মারা যায়।

মাধব: কিন্তু এই সব তুমি জানো কি করে? আমি জানিনা কেন?

দিব্য: গ্রামের সবাই জানে। সেই জন্যেই কেউ ওই পুকুরের দিকে যায় না। এমনকি তোর ঠাকুরদা নিয়ম করে দিয়েছিল যে এই বাড়ির কেউ দশমীর দিন ওই পুকুরের দিকে ঘুরেও তাকাবে না। তাও সেই বার তোর অভিলাষ কাকা, জোর করে যায় পুকুর পাড়ে, আর ঠিক একই ভাবে ডুবে মারা যান।

মাধব: আর তার পরের বছর বাবা হঠাৎ করে মুম্বাই তে চাকরি পেয়ে যায় আর আমাদের নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তোরা কেউ আমায় এটা বলিসনি কেন? কেউ বলেনি কেন?

উপেন: ঠাম্মি ভেবেছিলেন তোমায় দূরে রাখলে এই অভিশাপ থেকে তুমি বেঁচে যাবে। কিন্তু সেই তুমি ফিরে এলে। এই বাড়িতেই ফিরে এলে।

নেত্রা: ম্যাডি। আজ পূজা খতম হোনে কে বাদ, হুম সিধা মুম্বাই বাপাস চালেঙ্গে। মাই এখানে এক ভি দিন নাহি রুকনা চাহতি।

মাধব: তুমি সব জানতে?

নেত্রা: না। কিন্তু ওই মেয়েকে আমিও দেখেছি। ইয়ে ঘর আমাদের জন্য সেফ নাহি হ্যায়, ম্যাডি। তুমি অভি টিকিটস বুক করো।

মাধব: দাঁড়াও দাঁড়াও। যাবো বলেই যাওয়া যায়?

কাহিনি: বৌদি, বিসর্জনের সময় হতে চললো। তুমি ধাগাটা ওকে পরিয়ে দাও।

নেত্রা: হ্যাঁ...

মাধব: এই এইটা কী পরাচ্ছো? কী এটা?

নেত্রা: ইয়ে রক্ষা ধাগা হ্যায়। গুরুজি নে দিয়া হ্যায়। ইয়ে তোমহে উস বুড়ি আত্মা সে বচায়েগা।

[মাধবের হাতে ধাগা বাঁধতেই, একটা চিৎকার শোনা যায়: নাআআআ... ও আমার। তোরা ওকে আমার থেকে দূরে রাখতে পারবি না। আমি ওকে নিয়েই যাব। বসু বাড়ির শেষ প্রদীপ আমি নিভিয়ে দেবো]

মদন: এই বুড়ি পেত্নী... তুই মাধব কে নিয়ে যেতে পারবি না। আমরা দেবো না নিয়ে যেতে। প্রদীপ নেভাবে। প্রদীপ না সিগারেট যে নিভিয়ে দেবে?

কাহিনি: কী বলছিস?

[সাদা শাড়ি পরা, ঘোমটা দেওয়া একটা মূর্তি মঞ্চে প্রবেশ করে]

মদন: ও মা গো মা। ভূত। তুমি ওকে নিয়ে যাও। আমাকে ছেড়ে দাও।

নেত্রা: মদন ভাইয়া!!!

মাধব: তুমি... নিশি...? না তুমি নিশি না।

নেত্রা: ইয়ে ওহ আত্মা নাহি হ্যায়।

মাধব: ক... ক... কে তুমি? নিশি, তুমি আমায় নিয়ে যেতে চাইছিলে না? আসো নিয়ে যাও যদি ক্ষমতা থাকে।

[নিশির মঞ্চে প্রবেশ। শাড়ি পরা মূর্তি কে দেখে মূর্ছা যায়]

মূর্তি: এই মেয়েটা কে তুই ভুত ভেবেছিলিস? তুই ভেবেছিলিস এ আমি? কানের গোড়ায় এরম চাপাটি মারবো না? আমার কোন ক্লাস নেই নাকি?

উপেন: তুমি একে নিশি ভেবেছো?

মাধব: না তো কি... কে এটা? ভুতের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাবাড়ি!

মূর্তি: গ্রামের ডেসপো পাগলি। ছেলে দেখেই ঢলে পরে। আমি বিবাহিতা স্ত্রী। তোকে এরম লাইন মারবো? আমি পতিব্রতা।

মদন: আচ্ছা দিদা, তুমি তো আশি বছর আগে মারা গেছ? এই ভাষায় কেন কথা বলছ?

মূর্তি: বছরে তো ওই একটা দিন লোক মারি। বাকি ৩৬৪ দিন তো কিছু করার দরকার। তাই ওই টুবাই এর বাড়ির পেছনের গাছটায় বসে, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ওর টিভি দেখি। শ্রীময়ী না কী সব ছাইপাঁশ দেখতে থাকে। আগে বাংলা তে দেখতো, এখন হিন্দি তেও দেখে।

মদন: তুমি এতো বয়সে ও গাছে চড়তে পারো? হাঁটু তে লাগে না?

মূর্তি: আমি ভুত। এক লাফে উঠে যাই। ভালো মনে পরলো, এই তোর Jio+Hotstar আছে? তোকে নিয়ে যাবো বলে ক্যুকি সাস ভী কভি বাহু থি লেটেস্ট এপিসোড টা মিস করে যাবো।

মদন: তুমি এই সব সিরিয়ালও দেখো?

মূর্তি: আমি বেঁচে থাকতে শুরু হয়ে ছিল, তখনই দেখতাম। এখন নেশা ধরে গেছে।

কাহিনি: তুই ভুত এর সঙ্গে আড্ডা দেয়া টা বন্ধ করবি? নেত্রা, মাধব তোমরা এখান থেকে যাও। মা আছেন, ও তোমাদের কিছু করতে পারবে না।

মূর্তি: আজ দশমী। আজ আমি মাধবকে সঙ্গে নিয়ে যাবই।

নেত্রা: তুমি উসকে কহি নিয়ে নাহি যাবে। মাই নাহি নিয়ে যাওনে দুঙ্গি।

মূর্তি: দাঁড়া। BGM টা লাগাই। [শাড়ির ভিতর থেকে একটা ফোন বার করে BGM বাজায়।] এবার বল।

দিব্য: এটা কী ছিল?

মূর্তি: BGM বাজলে ফিলটা better আসে।

উপেন: নিশি ঠাম্মি, তুমিও একটা ফ্যান তাহলে।

মূর্তি: না তো কি? এতো নাটক করে লোক মারি কেন? একবার ঘাড় মটকে দিতাম। দশমী অব্দি অপেক্ষা করি কেন? জানিস জল টা কতটা ঠান্ডা হয়।

উপেন: তুমি এরম করবে আমি ভাবিনি।

মূর্তি: এই ছেলে। কুলাঙ্গার ছোটলোক। আমি ভাবলাম কোথায় পড়াশোনা করে বড়লোক হবে, তা না বসু বাড়িতে ঝি এর কাজ করে। আসে পাশের ভুতেদের সামনে আমার নাক কেটে পড়ে গেছে। আমাকে শেখাতে এসেছে!

মাধব: নিশি, আমি জানি তোমার আমার পরিবারের উপর খব আছে। তোমার সঙ্গে যা হয়ে ছিল, উচিত হয়নি। কিন্তু তার জন্য তুমি আমাদের কে শাজা দিতে পারো না। আমাদের বাড়ির অনেকেই তো তোমার রাগের শিকার হয়েছে। এবার তুমি চলে যাও।

মদন: হ্যাঁ, তুমি চলে যাও। নিশি ঠাম্মা। তুমি চলে যাও।

মূর্তি: তুই বেশী কথা বলবি না। যা গিয়ে ওই মেয়েটার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাক। সারাক্ষণ তো ওর আঁচল ধরেই ঘুরিস। তোমায় আমি নিয়েই যাব মাধব। তোমায় মেরে আমি আমার প্রতিশোধ পূরণ করবো।

নেত্রা: না! মা দূর্গা থাকতে তুমি আমাদের কিছু করতে পারবে না! [নেত্রা এক মুঠো সিন্দুর তুলে মূর্তির দিকে ছুড়ে দেয়। মূর্তি ভয়ে পিছিয়ে যায়]

কাহিনি: নেত্রা, ও মায়ের সিন্দুর কে ভয় পাচ্ছে। তুমি আরও ছোড়ো।

মূর্তি: চুপ কর। মারকুটে মেয়ে একটা। মায়ের সিন্দুর কে ভয় পাবো কেন? আমি বেধবা মেয়েছেলে। সিন্দুর ছুঁতে নেই। এইটুকুও জানে না আজকালকার মেয়ে-ছেলেগুলো। কী সংসার করবি রে তুই?

কাহিনি: পেত্নী কোথাকার? আমায় culture shame করছিস?

[কাহিনি প্লেট তুলে মূর্তি কে তাড়া করে]

মূর্তি: এই... এই মেয়ে দাঁড়া। দাঁড়া বলছি। উফফ্ কী মারকুটে রে বাবা!

মদন: এই তুমি কেমন ভুত গো? মানুষ কে ভয় পাচ্ছ?

মূর্তি: তোরা মানুষরাই তো সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। যে গাছ এ থাকি, সেটাই কেটে দিস। দেখছিস না চারদিকে? আমাকে আর শান্তি তে থাকতে দিস কোথায়?

মাধব: তুমি আমায় নিয়ে যেতে চাও তো? নিয়ে যাও। শেষ করো এই কাহিনি।

কাহিনি: এইইইইই...

মূর্তি: তুই না। আমার কাহিনির কথা বলছে।

কাহিনি: ওহহহ... তাও...

মূর্তি: তোকে আমি নিয়ে যাব আমার সঙ্গে। আমার প্রতিশোধ পূর্ণ হবে।

[মূর্তি মাধবের কাছে আসে। অনেক চেষ্টা করে মাধব কে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু জায়গা থেকে নড়তে পারে না]

মূর্তি: না... এই বুড়ো বয়সে আর আমার দ্বারা এই সব হবে না। থাক। অনেক হয়েছে প্রতিশোধ। আমি ওই গাছে বসে TV দেখি। তাই ভাল আমার জন্য। এই উপেন, বাবা কটা বাজল রে?

উপেন: ৭টা বাজতে যায়।

মূর্তি: এই আমি চলি। Kyuki Saas bhi শুরু হলো বলে। চললাম। তোমরা সবাই ভাল থেকো। টাটা।

[মূর্তি মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়]

মাধব: ব্যাপারটা হলোটা কী?

মদন: ব্যাপারটা হলো যে উনি চলে গেলেন।

দিব্য: কী হল জেনে লাভ কী? তুই ঠিক আছিস আর নিশির অভিশাপটাও কেটে গেল। আর আমাদের কিছু বোঝার দরকার নেই।

নেত্রা: হাঁ...

কাহিনি: ভালো থেকো বলে গেলো তো। কেটে গেছে।

মাধব: হুম...

উপেন: দাদা, মায়ের দয়া তে বিপদ কেটে গেছে। তোমরা গিয়ে বসো, আমি একটু সবার জন্য চা করে আনি।

দিব্য: এই মেয়েটার কি হবে?

মাধব: ওর কথা ছাড়ো। ভূতের মতন এমনি তেই ঘুরে বেড়ায়। ও ঠিক বেরিয়ে যাবে।

[ওরা সবাই বেরিয়ে যায়। নিশির জ্ঞান ফেরে]

নিশি: আমি কোথায়? এটা তো বসু বাড়ি। মাধব তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?

[নিশি বেরিয়ে যায়]

[মঞ্চের বাইরে থেকে শোনা যায়: আবার এই মেয়ে টা গায়ে পড়ে।

মূর্তির গলায়: কাউকে ছাড়বো না। আসছে বছর আবার হবে। সিরিয়াল শেষ হওবার আওয়াজ। আলো নিভে গেল]



সম্বিত কুমার সাহু

বিচার চাই

সায়ন্ত গোস্বামী

একটি বছর পেরিয়ে গেল, সঙ্গী শুধুই অশ্রুধারা,
চক্রান্তের মায়াজালে বিচার তবুও অধরা -
সবাই জানে কে করলো দুঃখিনী মাকে সর্বহারা,
অর্থলোভে ক্ষমতা ভোগে আজও তারা মাতোয়ারা।
চোখের জলে সুখে থাকে অসুর রূপী শক্তি যারা!
সন্তান হারার আর্তনাদে বিচার কেন দেই না সাড়া?

দুঃখিনী মা সবারে জানায়, দিন গুনছি বিচারের আশায়!
এইভাবে বিনিদ্র রজনী কাটাই, অবচেতনে ডাকি "আয়!, ফিরে আয়!"
আমি কেবল কষ্ট পাই, প্রতিক্ষণে মনে হয় এই বুঝি মেয়ের দেখা পাই -
অনুরোধ করি সবারে তাই, প্রতিবাদ হোক প্রতি রাস্তায় -
প্রার্থনা করি আমরা সদায়, আর কারও কন্যা যেন এভাবে না হারায়!
রাজপথে আবার নেমেছে সবাই, একটাই দাবি বিচার চাই।

যে দেশেতে সর্বদা রহে অবিচারের বাস,
সেই দেশেতেই পুলিশ আইন সবাই ক্রীতদাস!
বাড়ছে তাই দিনে-দিনে, দিকে-দিকে প্রবল সন্ত্রাস,
মানুষ কেমনে বাঁচিয়ে রাখবে আইনের প্রতি বিশ্বাস?
ধর্ষক আজও স্বর্গসুখে করছে বিচারব্যবস্থার উপহাস,
সুরক্ষিত তারা - যতদিন আছে রাজনীতির এই জটিল নাগপাশ।

এক হওয়ার সময় হলো, প্রতিবাদের আগুন জ্বালো,
দিকে-দিকে আওয়াজ তোলো, একদিন তবেই ঘুচবে কালো -
তাঁবেদারি করে কতদিন বলো, আদৌ কি আমরা থাকব ভালো?
আজও যদি মুখ বুজে চলো, বেঁচে যাবে ওই শয়তানগুলো!
যারা তিলোত্তমার প্রাণ নিলো, কিসের বিচার যে তাদের মৃত্যুদণ্ড না দিলো?
সমাজে কেমনে ফুটবে আলো, যদিনা কখনো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেলো!



Unspoken Love's Ode

Ankur Chaudhuri

The first day I saw you, my heart softly declared,
She's a wonder, a beauty beyond compare.
With each word exchanged, I was swept away,
By your kindness and love, in a gentle display.
I whispered to myself, she's out of my league,
A precious gem, so amazing and unique.
But how could I know, you might feel the same?
Amazed and confused, I played a timid game.
I shared my flaws, not "I love you," in disguise,
Your shy smile and shining eyes, my priceless prize.
From that day forth, my love began to bloom,
Embracing you as a partner, a daughter, a mother in the room.
I watched you grow from a bud so pure,
To a mesmerizing flower, your innocence secure.
Your eyes inspire me to reach new heights,
Guiding my soul through the darkest nights.
Remember, I'll be there, through ups and downs,
For your joy and pain, my heart resounds.
I'll let you go, for your good, with grace,
Even if it breaks me, shattering my place.
I'll love you, knowing you won't be mine,
On our last meeting, before your life's new sign.
With a warm embrace, a forehead kiss so dear,
"Goodbye, my future wife," I'll whisper near.
Then I'll hurt you, to make you forget me,
So, you can be happy, without regretting.
On your wedding day, I'll watch from afar,
Seeing you become someone else's star.
I'll tell him to cherish you, keep you safe and bright,
But you'll never know, hidden from sight.
With teary red eyes, I'll bid my last goodbye,
By the river, I'll sit, where memories lie.
In my heart's corner, you'll always remain,
In dreams, I'll recreate you, through every joy and pain.



What is Durga Puja for Me?

Dipali Chackravarty

Durga Puja is more than a Festival for Me — it is a living expression of resilience, hope, and collective spirit. In Today's fast-paced world, where stress, disconnection, and uncertainty often dominate our lives, the message of Ma Durga feels more relevant than ever to Me. The goddess embodies shakti, the strength to rise above challenges, to conquer inner battles, and to protect what is Just and True. Forever I feel, this translates into the courage to face personal struggles, the determination to stand for what matters, and the inner balance to stay rooted amidst constant change. However their is no time or rooted balancing available these days hence no inner balance, because their is only determination to bring trouble in life than Face Trouble. I relate more to this now than before because I realise it with experience that I play diverse role's, A Daughter, A wife, A mother and an Educator. However staying in A Metropolitan City, I often hear loud speaks of strength in terms of power, success, or achievement, And my heart skips a beat because it's true for all and for all times that, true strength lies equally in the ability to be emotionally available, to connect deeply with oneself and with others through compassion, understanding, and presence, that unfortunately in the Race to achieve the unachievable almost all have forgotten. This is where I feel the essence of Maa Durga becomes profoundly relevant for Me. Durga Puja reminds me of my childhood days of community connections and belonging. In today's time when many feel isolated despite being digitally connected, the Puja becomes a space of togetherness where music, rituals, food, and celebration weave people into one fabric of joy and devotion. It tells us that even in diversity, unity is possible. I like to wonder thinking positive, however I know what is reality. Are we forgetting our cultural essence —

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

Yā Devī Sarva Bhūteṣhu Mātṛ Rūpeṇa Samsthitā,
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaḥ.
To the Divine Goddess who dwells in all beings in the form of the Mother—
We bow to her, we bow to her, we continually bow to her.

This verse beautifully reminds us that emotional availability is, in essence, an expression of the divine motherly presence, A reflection of Maa Durga's nurturing power in our everyday relationships. She is not just the vanquisher of demons, she is the embodiment of nurturing, protective, and compassionate energy. She is fierce when it comes to standing against adharma, yet tender when embracing her devotees with motherly love. This balance mirrors the heart of emotional availability, the courage to face challenges while remaining open, empathetic, and connected. When I look to Maa Durga, I see the perfect harmony of strength and softness. Her many arms symbolize the ability to hold diverse emotions and responsibilities without losing balance. In relationships too, emotional availability means holding space for both our own emotions and those of others with the same grace, being strong, yet kind; present, yet resilient. Through her, we can learn that being emotionally present is not a weakness but a divine strength. It builds trust, nurtures bonds, and transforms interactions into sacred connections. Just as Maa Durga conquers darkness with her light, we too can conquer the barriers of distance and misunderstanding by choosing to be emotionally available. However I don't see most of the kids treating their mothers with the respect love and care they deserve.

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोऽस्तु ते॥

O Gauri, the source of all auspiciousness, I bow to You.



মুখোশ

সমীপেন্দু দাস

আমরা সবাই একটা করে মুখোশ পরে চলি—
তারপর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি,
আমার 'আমি'টাকে অযত্নের কারাগার থেকে বের করে এনে যেই বিদ্রোহ করি!

ঠিক তখনই বিদ্ধ হই সমালোচনার তীরে—
তাই, একবার হেসে নিয়ে আবার নিজেকে বন্দি করি নিজের মধ্যে।
আর, অভ্যাসমতো মুখোশটা আবার লাগিয়ে নিই মুখের ওপর।

আমাদের শৈশবে অনেক স্বপ্ন ছিল,
অনেকেই আমরা অনেক কিছু হতে চেয়েছিলাম।
যখন একটু একটু করে বড় হলাম, আবেগটাই রয়ে গেল।

যে ছেলেটা তখন কবিতা লিখে সবাইকে ডেকে ডেকে পড়ে শোনাত—
আজ, সে অভিমানগুলো ছন্দ দিয়ে সযত্নে লিখে রাখে খাতার ভাঁজে।
যে ছেলেটা গান ভালোবাসত—
অথবা, যার বাসনা ছিল শিল্পী হওয়ার,
বড় হয়ে, সেও নিজের সৃষ্টি-গুলো লুকিয়ে রাখল আড়ালে।



আসলে, সবাই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল।

সমাজের শৈশব দু'টো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে,
এক শৈশব কেবল পড়াশোনা নিয়েই থাকে।
ওদের কাছে বাকি সব কিছুই অযৌক্তিক, সময় নষ্ট।
ওরা ছোট থেকেই পেশাদার।

আরেক শৈশব পড়াশোনাতেও ভালো,
শুধু শিল্পটাকে ভালোবেসে, উপলব্ধি করে, চর্চা করে।
তারই সাথে, বাকি শৈশবের থেকে নিজের সৃষ্টির একটু কদর চায়।

দুটো শৈশবই হঠাৎ করে বড় হয়ে গেছে—
শুধু, দ্বিতীয় শৈশব— প্রথম শৈশব আর সমাজের কাছে সমালোচিত, নিন্দিত।

মুখোশটা যে বড্ড দরকার!
ওদের মাঝে, ওদের মতো হয়ে বাঁচতে হবে তো!

অপেক্ষা

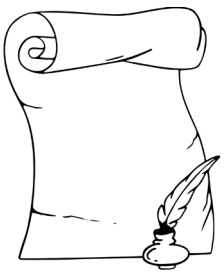
সুজিত দাস

কত দিন যে বসে আছি, জানি না ঠিক,
কতবার যে চেয়ে দেখি পথের দিক।
হাওয়ায় ভাসে তবু তোমার গন্ধের ছোঁয়া,
মনে হয় তুমি বুঝি এসে যাবে গোপনে কোনো এক ফাঁকে।

রাতের তারাগুলোও জিজ্ঞেস করে আজ,
"কবে আসবে সে, কবে হবে মোলাকাত?"
চাঁদ ঝুঁকে দেয় মাথা, হেসে বলে চুপিচুপি,
"সেই অপেক্ষা-রঙিন গল্পটা জমে রইলো তারই থলিতে।"

গাছের পাতা দুলে ওঠে, বাতাসে বাজে সুর,
তোমার পায়ের শব্দ শুনি, অদেখা এক দূর।
আলো-ছায়ায় মিশে যায় বুকের গভীর বেদন,
তবু মনে হয়, আরেকটা দিন, হয়তো আসবে নিমন্ত্রণ।

জানো, এই অপেক্ষা কোনো বোঝা নয়,
এ যে তোমার স্মৃতির সুরভি ভরা পথের পরিচয়।
তোমার আসার খবরে যেন বসন্তের গান,
তোমার নামেই লেখা রইলো এই প্রতীক্ষার মান।



প্রেম করদান

নির্মাল্য নন্দী

হে নবজীবনধারা, পথহারা বড় আমি—
তোমার স্রোতে বুক পেতে দাঁড়িয়ে মুক্তিকামী।
পূর্বস্মৃতির বিরহ মলিন সকল নড়ি স্মৃতি
পঞ্জর হতে জানান দেয় বিষের অন্তর্ধূতি।
উষ্ণতা তব পারে শুধু এই কষ্ট থেকে বাঁচাতে,
প্রাণপাখিখানা পুরে নিতে পারো তোমার প্রেমের খাঁচাতে।
তবে দিনের শেষে আমায় নিয়ে কথা কয়ো একান্তে,
ফিক করে হাসি ঠোঁটে খুঁটে নেবো—পারবেনাকো জানতে।
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও করে ঘুম ভেঙে উঠে বসি,
প্রার্থনা যেন ঘুম ভাঙ্গে শুধু তোমারই মুখোমুখি।
কানহা কে আমি শুধু জ্বালাই, চাই শুধু বরদান;
তিনি বলে যান, কর অপেক্ষা কর প্রেম করদান।
মুখোমুখি তার, বসে আমি তাই অপেক্ষা শেষ করি—
লোকে বলে ফের পাগল হলো রে আমি বলি বেশ করি।



সঞ্চারী মন্ডল

নর্মদা মিদ্দে



উড়ান

সৌরভ দাস

এবারও বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিল না ছেলেটিকে,
মাটির সোঁদা গন্ধ মেখে ওঠা হলো না তার এবারও,
দীর্ঘ নিঃশ্বাসে কেটে গেলো এবারের বর্ষার মলিনতাও।
হয়তো কখনো শ্রাবণের চিঠিগুলি এসেছিল তার কাছে, তার ঠিকানায়,
তবে চিনতে পারেনি সে, বাস্তবতার কোলাহল চিনতে দেয়নি তাকে।
চিনতে পারেনি শ্রান্ত নদীর নিবিড় প্রশান্তিকে,
চিনতে পারেনি কাদামাটির পথের ব্যাকুলতাকে,
শুধু উদাস মুখে তাকিয়ে দেখেছে সবুজ ঘাস আর লতাগুল্ম,
কখনো বা নীল আকাশের শঙ্খচিলের, কিংবা হেমন্তের ধানক্ষেত।
হতাশ হয়েছে শুধু – ঝিঁঝিঁর শব্দ, বন্য পাখির ডাক, মঝি-মাল্লাদের গান যেন কানে লাগে তার।

সবই খুব কাছে তবু অচেনা, সে বুঝতে চায় –
সে উড়তে চায়, ওড়বার স্বপ্ন দেখে সে, ভয় পায়,
সে জানে না কারা কবে এসে তার ডানা কেটে দিয়েছে,
কারা যেন এসে তার শিখির ভেজা পায়ে শিকল পরিয়েছে, তবু ছোটে সে – ধ্রুবতারাকে চিনতে,
রাতের আকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্কের মাঝে সে খুঁজে পায় –
হাজার হাজার তারই মতো শিকল পরা পাগলদের, অসংখ্য 'পাথর'—
অসংখ্য দুঃখ বিলাসে মত্ত 'পৃথিবী'র মুখমন্ডল ভেসে আসে সামনে। তারা উড়তে চায়!

দিনের শেষে ক্লান্ত পাগলটি ফিরে আসে কোথাও এক অভিমানী শান্তির খোঁজে,
'জীবনের ছোঁয়ার অপেক্ষায়'—
ঠিক যেমন বসন্তের ছোঁয়ায় প্রাণ পাওয়ার আশায় বসে থাকে আমগাছের ন্যাড়া ডালটি।
কিন্তু সে পায় না, পায় না বলেই দম বন্ধ হয়ে আসে রোজ –
তবে এভাবেই কোনো একদিন ব্যথ্যায় চিৎকার করে উঠবে সে,
হয়তো সেদিন শ্রাবণের ভেজা রাস্তায় ভালোবাসার উদযাপনে হারিয়ে ফেলবে নিজেকে,
চিনবে সবকিছু, ফিরে পাবে তার বিরহহীন যৌবন, ভিজবে সে,
স্বাধীনতার উড়ানে ভাসবে তার মতো অনেক শুভ্র 'পৃথিবী' – ঠিক ঐ শঙ্খচিলের মতো – তবে আজ আর নয়।



পাথরের ভালোবাসা

সোমদীপ মাজী

আমি বসে থাকি মৃত পাথরের মত
কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে যায়,
বয়ে যায় বসন্তের পরশ, শরতের বাতাস—
তবু আমি বসে থাকি।
বৃষ্টির নরম ফোঁটা ক্ষইয়ে নিয়ে যায় আমার শরীর।
আমি ক্ষইতে থাকি সময়ের বেগে।

আমি ভালবাসি ।
ভালবাসি সুন্দর দোয়েল পাখিদের,
তাদের লেজ নাচিয়ে গাওয়া গান,
তাদের সুন্দর চোখে তাকানো।
আমার গর্ত, কোটরে তারা বাসা বাঁধে।
তারা গ্রাস করে আমার হৃদয়,
শক্ত ঠোঁটের নির্মম আঘাতে টুকরো হয় হৃদয়,
বৃষ্টির জল ধুয়ে নিয়ে যায় লাল রক্ত।

বিদ্রোহী আমি,
আমি স্বার্থপর, নির্মম, আমি...
আমি চাই নড়ে উঠতে, ধ্বংস করে দিতে চাই সমস্ত ভালবাসা, ভালোলাগা।
পাথরের কর্কশ আঘাতে পিষে দিতে চাই নরম শরীর।
আমি শিখতে চাই, নির্মম আঘাতের সুন্দর শিল্প।
নিষ্ঠুর সুন্দরভাবে গুঁড়িয়ে দিতে চাই সমস্ত বাসা, ভালবাসা।
কিন্তু...

তবু আমি বসে থাকি, রক্তাত পাথরের মত—
বৃষ্টি আসে, আসে ধ্বংস,
ক্ষইতে থাকে জীবন।
দোয়েল পাখিরা সুন্দর ঠোঁটে খুবলে খায় মাংস।
আমি বসে থাকি ক্ষইতে থাকা পাথরের মত,
আধ-খাওয়া শরীরের মত।



আমরা বড় হয়ে গেছি

সমীপেন্দু দাস

সেই যে ছোটবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—
আমাদের আর বাড়ি ফেরা হলো না।

যখন বাড়িতে ছিলাম,
মনে হতো, "কবে যে বড় হবো!"
বড় হলে তো কোনো শাসন থাকবে না।

সময়ে স্কুলে যাওয়া, বাড়ি ফেরা, পড়তে বসা—
এসব বোরিং রুটিন কাজ করতেও হবে না।

মনে হতো— "কবে যে বাড়ি থেকে বেরোবো!
অগাধ স্বাধীনতা আর অফুরন্ত সময়, কবে যে পাবো!"

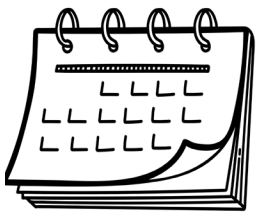
যখন একটু বড় হলাম—
স্বাধীনতা পেলাম, সময় পেলাম, বাড়িটা পেলাম না।

আরও একটু বড় হলাম—
স্বাধীনতা পেলাম, দায়িত্ব পেলাম, সেই সময়টা ফিরে
পেলাম না।

এখন তো অনেক বড় হয়েছি,
মাঝেমাঝে যখন জীবন নিয়ে ভাবি—
দেখি অর্থ পেলাম, বিলাস পেলাম।
শুধু সেই সারল্য, ভালো থাকা আর হাসিটা কখনোই
ফিরে পেলাম না।

হঠাৎ যেন শৈশব কানে কানে এসে বলে যায়—
"কে বলেছিল বড় হতে?"

সেই যে সতেরোয় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম—
তারপর, কোনোদিন বাড়ি ফেরা হলো না...



হতভাগ্যের ক্যালেন্ডার

প্রিয়েষ রায়

ক্যালেন্ডার-এর তারিখগুলো
গোল করে দাগানো—আমার স্খলনের দিনগুলি।
কিছু দাগ ঝাপসা হয়ে গেছে,
তবে আমার স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।
নেমেসিসের অপেক্ষায়
শাশ্বত যন্ত্রের মতো কার্যহীন কার্য করে যেতে যেতে, আমার
বাহুদ্বয় ক্লান্ত।
বন্ধুরা বলে
সমুদ্রের জল হয়তো স্বাদে কটু,
কিন্তু তাতে পরাক্রমী তরঙ্গের শক্তি নিবেশিত থাকে;
নিরীহ দিনগুলিতে তার দৌড় সৈকত পর্যন্তই;
তবে সুনামির দিন—সবাই জানে।

কিন্তু,
আমি অথৈ নোনাজলেই দিন কাটাই;
তেষ্টা আমার নোনাজলেই মেটাতে হয়।
আমি নেমেসিসের অপেক্ষায়।
আসবে কবে সে?
সামনের মাসের ৩৩ তারিখ!

উটপাখি জীবন

জাহাঙ্গীর লিটন

রাতভর ওত পেতে জেগে থাকে নিশাচর।
বুক চিরে উড়ে গেলে জোনাকির শকট,
প্রেমহীন শৃঙ্গারে মেতে উঠে মহানগর—
তারপর।

পেশাদার খবরের কাগজ ভেসে যায়
দ্রোণাচার্যের আর্য স্তুতিতে;
একলব্যরা খেলার আগেই
মুচলেকা দিয়ে পালায়।

উটপাখি দিনযাপন শেষে
উদাস দাওয়ায় হাঁটি,
নিরবে স্তিমিত হয় কত চিৎকার।
কানে ভালো তুলো গুঁজে
সুখের জাবর কাটি।

গনগনে সূর্যের আঁচে ঝরতে থাকে
স্বপ্নের মেদ—
বেড়িয়ে পড়ে হাড়গোড় চর্মসার
নীল-সাদা দেয়াল জুড়ে,
কাণ্ডহীন জ্ঞানের চাষাবাদ।



অঙ্ক নাকি আতঙ্ক

রুদ্রদীপ দাস

নাম আমার গণিত,
কারো কাছে সমস্যা, কারো কাছে সমাধান;
কেউ ভাবে বরফ-স্তুপ, কেউ ভাবে কামান।
আমার মধ্যে আছে এস. এন. দে, আর্যভট্ট,
নিউটন, নাগের হাসি অট্ট:
যদিও আমি গণিত নামে পরিচিত,
কেউ বলে অঙ্ক, কেউবা আতঙ্ক।
যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ থেকে
বানিয়েছি নিজেকে জটিল,
মনে করি সমান এক্স ধরে
করেছি কত সমস্যার সমাধান,
তবুও অনেকের কাছে আমি নাকি বেমানান?
অবকল থেকে সমাকল, সমাকল থেকে অবকল,
আমার রয়েছে অবস্থান বৃহৎ-ক্ষুদ্র;
পেয়েছি আমার চরম ভক্ত,
সে গণিতপ্রেমী রুদ্র।

জ্যোৎস্না

সায়ক শাসমল

হঠাৎ করেই
কোথা থেকে এক কিঞ্চিৎ আলো,
যেন চারিদিক মনোময়।

কিন্তু আলো তাও কিঞ্চিৎ!?
কিসের আলো তবে ইহা !?
সময়ের তালে ,
সেই আলোর স্পর্শে
চারিদিক হয় আরও মুখরিত।

তবে কি ইহা কোনও জ্যোৎস্না !?
কোথায় জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা!?
এ তো উৎসবের জ্যোৎস্না !!!!
তাই চারিদিক আজ থেকেই
নতুন সজ্জায় সজ্জিত !

শব্দজব্দ

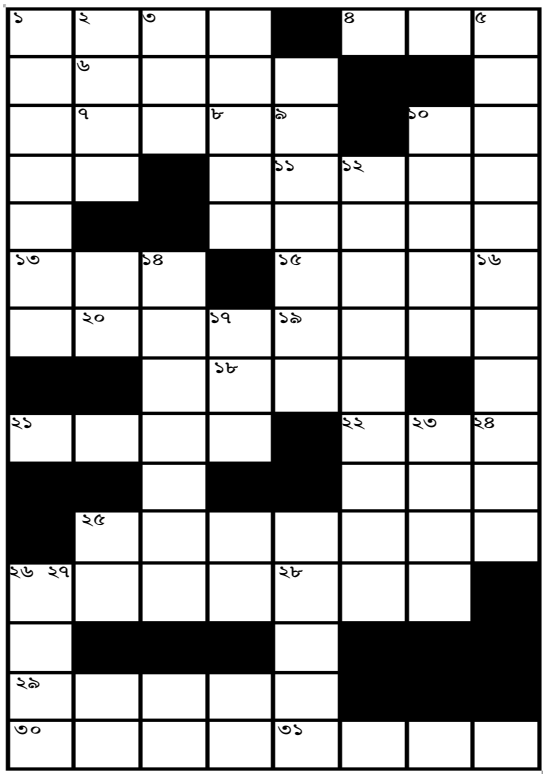
শ্রীরাজ চন্দ্র, স্বর্ণাভ চক্রবর্তী, ও দেবাঞ্জন সাহা

উপর–নীচ

১. এক প্রকারের যোগাসন (৭)
২. হতভম্ব (৪)
৩. পাখাবিশেষ (৩)
৫. কুয়াশা (৪)
৮. স্বামীর ভাই (৩)
৯. সুকুমার রায়ের বিখ্যাত সৃষ্টি (৫)
১২. অভ্যর্থনা (৩)
১৪. গান্ধীজীর একটি আন্দোলন (৭)
১৬. যথার্থভাবে (৪)
১৭. ঢেউ (৩)
২৩. কাঠের পাতবিশেষ (৪)
২৪. একপ্রকারের গাছ (৩)
২৬. দেবীর মর্ত্যে আগমন (৪)
২৮. মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ (৪)

পাশাপাশি

১. পথিক (৪)
৪. সন্তুর কুকুর (৩)
৬. অন্ধকারকে জয় করে যে (৪)
৭. লাশ (৪)
১০. প্রাচীন ভাষা (২)
১১. অবসান (৪)
১৩. সোজা (৩)
১৫. যুদ্ধজাহাজ (৪)
১৮. রজনী (৩)
১৯. রাবণ (৪)
২০. উত্তল নয় (৪)
২১. খারাপ লোকের সাথে মেলামেশা (৪)
২২. যা দেখা যাচ্ছে (৩)
২৫. আগে যাকে মানা হয় (৪)
২৭. আত্মহত্যা (৫)
২৯. বলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী (৫)
৩০. এশিয়ার বৃহত্তম হরিণ (৪)
৩১. দুর্ভিক্ষ (৪)



সুদোকু

সায়ক মাজি, দেবস্মিতা মোদক

		৮		৯	৭			
			১	৫		৩	৭	৬
			২				৮	
৭						৮	৬	
৫								২
	৪	৯						৭
	১				৯			
৬	৭	৪		২	১			
			৩	৬		৭		

Alma Mater

Souvik Chakraborty

The cold morning breeze ushers in the ultimatum,
it is time, time indeed,
to leave my alma mater.

Bags at bay, trolley in hand,
I gaze back at my boarding room,
the very room,
that once had seemed shabby, dim and bland.

And yet, over time, it had transformed
to my abode, my safe space.
Time bends perceptions, does it not?
Moulds the mind to embrace the odds.

Today, of all days,
the room seems flawless,
perfect with its imperfections -
the cracked walls, the pitted floor.
Makes me wonder -
was perfection ever ubiquitous?

The last sunrise over my tapering balcony,
the first of many such lasts?
Possibly a testament to life's undulating journey,
traversing through the bright and the monotony.

Many have left before me,
And many more shall,
And makes me wonder -
does the room have its story?
Or is it just a part of mine?



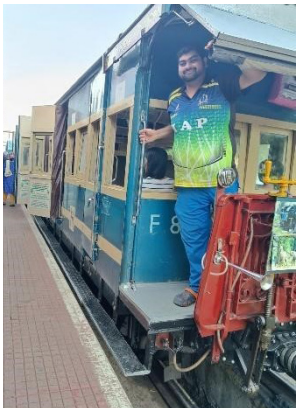
রানীর দরবারে: এক ভ্রমণপিপাসুর উটি-অভিজ্ঞতা

দেবজ্যোতি মন্ডল

প্রতিদিনের রোজনামচায় যখন হঠাৎ মনটা হাঁপিয়ে ওঠে এবং রোজকার একঘেয়েমির ক্লান্তি কাটাতে মনটা উড়ু উড়ু করে, তখন ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ি কোনো নতুন, চেনা বা অচেনা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এমনই এক শরতের দিনে বেরিয়ে পড়লাম এক রানীর খোঁজে। যে রানীর রাজ্যে অতন্দ্র প্রহরীর মত উঁচু উঁচু গিরিশৃঙ্গ রয়েছে, রয়েছে সবুজের সমারোহ, অবাধ্য মেঘেদের ছুটে বেড়ানো আর প্রাণোচ্ছল ঝর্ণার কলকলানি। সেই রানীর নাম উদগমন্ডলম (Udhagamandalam), যাকে আমরা ভালোবেসে উটি (Ooty) নামে চিনি। উটি নামটি এসেছে টোডা উপজাতির শব্দ "Othakal-mund" থেকে যার অর্থ "একটি পাথরের গ্রাম"। রাজকীয় নীলগিরি শৈলরাজি, অনবদ্য আবহাওয়া, এবং অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিবেষ্টিত উটি সত্যিকারের শৈলশহরের রানী (Queen of Hillstations)।

কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু থেকে উটির দূরত্ব প্রায় ২৮০ কিলোমিটার। সড়কপথে বাস বা প্রাইভেট গাড়িতে ৬-৭ ঘণ্টার মধ্যেই উটি পৌঁছে যাওয়া যায়। আমরা অবশ্য ঠিক করলাম যে উটি যাব ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে খ্যাত নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়েতে করে – যাকে আমরা উটি টয় ট্রেন নামে চিনি। সেই মতো আমরা শরতের রোদ মাখতে মাখতে এসে পৌঁছালাম মেট্টুপালায়াম (Mettupalyam) স্টেশনে।

মেট্টুপালায়াম থেকে উটির উদ্দেশ্যে প্রথম ট্রেন ছাড়ে সকাল ৭:১০ নাগাদ। এখানে বলে রাখা ভালো যে টয় ট্রেনের টিকিট আগে থেকে বুক করে রাখা উচিৎ। টিকিট পাওয়া যায় IRCTC-র ওয়েবসাইট থেকে, তবে এর চাহিদা প্রচুর, ঠিক যেন জটায়ুর ভাষায় – "সেলিং লাইক হট কচুরিজ।" মেট্টুপালায়াম থেকে উটির দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার, আর এই পথ যেতে টয় ট্রেনের সময় লাগে প্রায় ৫ ঘণ্টা। পথে পড়ে ২৫০টারও বেশি সেতু, ১৬টারও বেশি সুড়ঙ্গ, আর তার সঙ্গে রয়েছে অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক শোভা ও মেঘের লুকোচুরি খেলা। স্টিম ইঞ্জিনের সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যখন ট্রেনটি পাহাড়ের বুক চিরে কাল্লার, হিলগ্রোভ, কুন্নুর, ওয়েলিংটন প্রভৃতি স্টেশন পার হয়ে এগিয়ে যায়, তখন মনে হয় যেন শৈলশহরের রানী অকৃপণ হাতে আমাদের বরণ করার জন্য ডালি সাজিয়ে রেখেছেন। কথায় শুনেছিলাম, "The Journey is more important than the Destination." উটির টয় ট্রেনের যাত্রা যেন সেই কথাটাকেই রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করিয়ে দিল। এভাবেই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রৌদ্র-ছায়ার সঙ্গে মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে আমরা উটি পৌঁছে গেলাম।





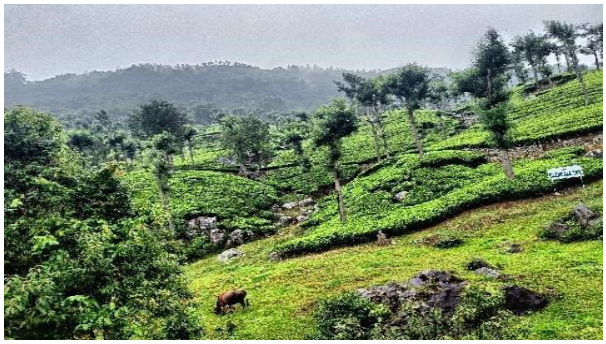
উটিতে পৌঁছে আমাদের প্রথম কাজ হলো রাত্রিবাসের জন্য স্থান খুঁজে বের করা। উটি শহরে অনেক হোটেল, পান্থশালা, হোস্টেল, হোমস্টে, রিসর্ট ইত্যাদি আছে। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা একটি ছিমছাম, সুন্দর এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল দেখে বুক করে নিলাম। মাথার উপর একটা ছাদের জোগাড় হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম উটির রূপ রস অনুধাবন করতে। এখানে বলে রাখা ভালো যে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অনেক শৈলশহরের মতো এখানে নিজেরা স্কুটার বা বাইক ভাড়া নিয়ে ঘোরা আইনত নিষিদ্ধ। তাই সমস্যার সমাধানে স্থানীয় গাড়ি বা অটো ভাড়া করে আমরা উটির প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখতে বের হলাম।



উটি লেক: উটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় এমন দূরত্বে অবস্থিত উটি লেক একটি বড় প্রাকৃতিক হ্রদ। এখানে বোটিং এবং অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থার পাশাপাশি কেনাকাটার জন্য একটি স্থানীয় বাজারও আছে। এটি বহুল জনপ্রিয় স্থান হলেও যত্ন ও পরিচর্যার অভাবে প্রচুর কচুরিপানার উপস্থিতি আমাদের বেশ হতাশ করেছিল।

দোড্ডাবেংটা শৃঙ্গ: দোড্ডাবেৎটা হলো নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৬০০ মিটার। এটি উটির





অন্যতম জনপ্রিয় আকর্ষণ। হঠাৎ নেমে আসা মেঘের সঙ্গে খেলা করার পাশাপাশি টেলিস্কোপ হাউস থেকে প্রকৃতির আপন তুলির টানে আঁকা সমগ্র নীলগিরি পর্বতের এক অনবদ্য দৃশ্যপট মনের গভীরে দাগ কেটে যায়।

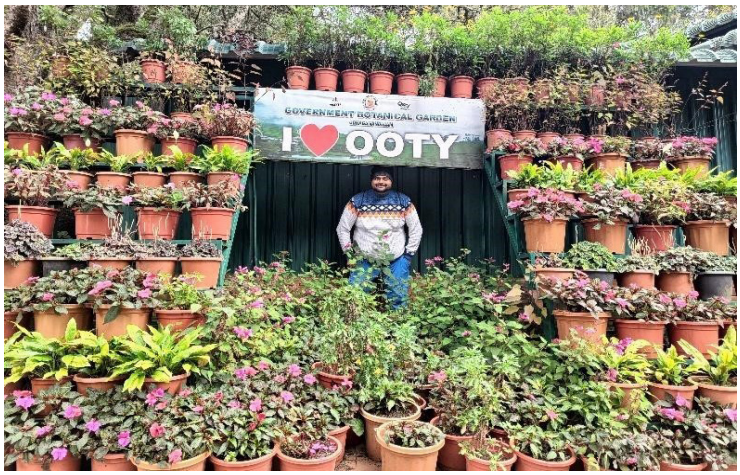
উটি বোটানিক্যাল গার্ডেন: তামিলনাড়ু হর্টিকালচার বিভাগের অধীন এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটি মোট ৫৫ একর জায়গা জুড়ে প্রায় ৬৫০ প্রজাতির গাছপালা নিয়ে গড়ে উঠেছে। সকালে প্রাতঃভ্রমণ অথবা সপরিবারে সময় কাটানোর জন্য এর চেয়ে ভালো স্থানের জুড়ি মেলা ভার।

টি এন্ড চকলেট ফ্যাক্টরি: দোড্ডাবেৎটা থেকে খুব কাছেই অবস্থিত টি অ্যান্ড চকলেট ফ্যাক্টরি উটির আরেকটি জনপ্রিয় স্থান। এখানে পর্যটকরা নীলগিরিতে চা চাষের ইতিবৃত্ত এবং কীভাবে তা প্রক্রিয়াজাত করা হয় সে সম্পর্কে জানতে পারেন। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন জাতের চা এবং হাতে তৈরি চকলেটের স্বাদও নিতে পারেন এবং প্রয়োজনমতো সংগ্রহও করতে পারেন।

নাইন মাইল ও পাইন ফরেস্ট: উটি থেকে কিছুটা দূরে কুন্নুরের কাছে রয়েছে বিশাল তৃণভূমি, যা নাইন মাইল নামে পরিচিত। এছাড়া নিকটবর্তী পাইন ফরেস্টটিও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। অনেক জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতীয় এবং হিন্দি সিনেমার শুটিংয়ের কারণে এই দুটি স্থান সাধারণের কাছে 'শুটিং স্পট' নামে প্রচলিত।

এ সব ছাড়াও উটি থেকে কিছুটা দূরে পাইকারা জলপ্রপাত, পাইকারা হ্রদ, অ্যাভালঞ্চ লেক, এমারেল্ড লেক, মাদুমলাই ব্যাঘ্র প্রকল্প – এগুলোও উটির অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া চলার পথে কত নাম না জানা ভিউপয়েন্ট চোখে পড়বে। প্রকৃতি পরম আদরে ও অকৃপণ হাতে সাজিয়েছে তার রানীর রাজ্যকে। উটির স্থানীয় বাজার এবং রেস্তোরাঁগুলোর কথা না বললে এই ভ্রমণের অনেকটাই বাকি রয়ে যায়। এই বাজারে যেমন স্থানীয় হস্তশিল্প, চকলেট, শীতকালীন পোশাক ইত্যাদি পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় বিভিন্ন কৃষিজাত সামগ্রী, ফলমূল, নানা সবজি ও ভেষজ দ্রব্য। এছাড়া, জুনিয়র কুপ্পানা, হায়দ্রাবাদ বিরিয়ানি হাউস, আর্লস কিচেন, কৈলাশ প্রভাত, দর্শন ভেজ ইত্যাদি রেস্তোরাঁগুলো স্থানীয় স্বাদ ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে। ভোজনরসিকদের জন্য এটি এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসা আমাদের এই ভ্রমণপিপাসু মনগুলো ক'দিন উটির শান্ত পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এবং ঐতিহ্য উপভোগ করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে আর আগামী দিনের পথ চলার জন্য নতুন করে শক্তি পায়। শৈলশহরের রানী মন থেকে ক্লেদ ও গ্লানি দূর করে উপহার দেয় এক অবিস্মরণীয় চিরস্থায়ী স্মৃতি এবং অপেক্ষা করে আবার এক নতুন রূপে ধরা দেওয়ার জন্য।





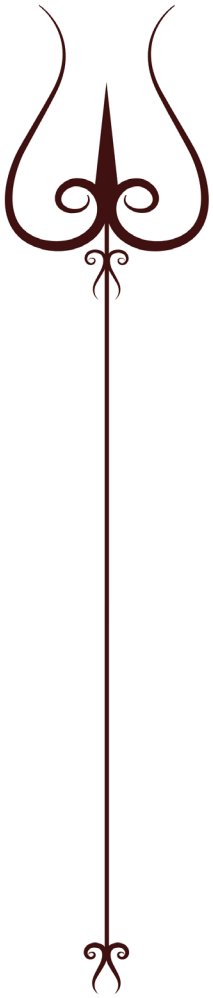
তীর্থেন্দু বণিক



সুমেধা চৌধুরি

Abuse

Tanvi Agarwal



The left traces of her
Used to hit her hard
She, the little girl, eaten by the ghost
The ghost of uncontrolled desires,
The ghost or a sensible man
Difficult to understand
Who ignored the innocence of her
And looked at her childish body
With the drooling eyes
She found her uncovered
Badly Touched by a dead life (man)
The trauma, the fear or the questions
Swirling in her mind
Who was that ghost, was it a human?
Or a heartless, without hypothalamus (part of the brain for emotional response)
She is an adult now, happy;
But this interaction with a ghost
Makes her feel lost
Because her longing to have someone by her side
All the time, to be protected from ghosts
Is still not gone.
Whenever she find her alone, she is suffocated
Not with her present problems
But with the past, making her feel
Again the ghost will come to take the taste of her.
She is confused, is this real worry or becoming an excuse of her Tangling between her desire to be strong and fearless.
The left traces of her
Used to hit her hard.

শেষের প্রার্থনা

আবীর রায়

উমা,ঘুম নিয়ে যা চোখে,
দিনের শেষে, রাতের দেশে।
একবার দে, দরজাখানি খুলে,
সত্যি বলছি — আর যাবো না পালিয়ে।

দিনের দেশে আমার আপন কেহ নাই,
আমার দেশে অচেনা সবাই।
আমার দেশে সবার গল্প চাই,
সবার গল্পের মাঝে কেবল আমি নিভে যাই।

গল্পকথার দেশ যদিও বা পেরিয়ে যাই,
বেলাশেষের পাঁচিলে আটকা পড়ে যাই।
যদি তখন পাড়ের সিঁড়ি চোখে পড়ে যাই,
পায়ে বাঁধা শিকলটা আটকে রেখে দেই।

আটকা পড়ে চুপটি করে বসে থাকি,
কত কথা মনে ভেসে ওঠে।
আমারও একটা গল্প ছিল,
গল্পের ছেলেটার — তারও স্বপ্ন ছিল।
আজ সে অন্য কথা বলে,
নিজের বাড়ি থেকে, সে বহু দূরে থাকে।

উমা, ঘুম নিয়ে যা চোখে,
দিনের শেষে, রাতের দেশে।
একবার দে, দরজাখানি খুলে,
সত্যি বলছি — আর যাবো না পালিয়ে।



মেঘ মিলন

চিরন্তন (শাশ্বত)

মন যে আমার জেদী বেজায়
ঘন কালো মেঘ কে সে চায়,
দেখে কেমন ভেসে বেড়ায়
সাগর মরু মিশে।

শুষ্ক মরু তৃষার ঘোরে
কেমনে যাবে সাগর তরে,
পবন কে সে প্রশ্ন করে
উদাস হয়ে বসে।

বাতাস যে তার কষ্ট শুনে
উড়ায় তারে গগন কোণে,
বাষ্প যেথায় প্রহর গুনে
মিলনের আবেশে।

সাগর মরু এক হলো যেই
নামটি যে তার মেঘ হলো সেই,
সব বাধাকে এড়িয়ে যে ধেই
ভাসে সে বিলাসে।

মন ভাবে সে মরুর প্রায়
উড়াবে যত দুঃখ যেথায়,
মিলবে তারও সাগর সেথায়
ভাসবে সে উল্লাসে।

শব্দজব্দের উত্তর



সুদোকুর উত্তর

৪	৬	৮	২	৯	৭	৫	১	৩
৯	২	৩	১	৫	৮	৩	৭	৬
১	৫	৭	২	৩	৬	১	৮	৪
৭	৩	২	৪	১	৫	৮	৬	৯
৫	৮	৬	৯	৭	৩	৪	১	২
২	৪	৯	৬	৮	১	৩	৫	৭
৩	১	৫	৭	৪	৯	৬	২	৮
৬	৭	৪	৮	২	১	৫	৯	৩
৮	৯	২	৩	৬	৫	৭	৪	১

২০২৫ পুজো কমিটিতে আমরা যারা রয়েছিঃ

ফ্যাকাল্টি বডি: ড. তপজ্যোতি দাসগুপ্ত।

স্টুডেন্ট বডি: প্রীতম, মধুরা, দীপ, শ্রীরাজ, নভনীল, অনন্যা, অর্ণব, সায়ক, অনিমেষ, ক্যামেলিয়া, দেবস্মিতা, রোহিত, শ্রেয়ম, সুরজিৎ, নীলাদ্রি, শীর্ষেন্দু, অরণ্য, সঞ্চারী, সৌহার্দ্র্য, সায়ন্ত, প্রতীপ, রুদ্রদীপ, অভয়, জিষ্ণু, স্বতন্ত্র, তন্ময়, উদ্দীপন, সৌভিক, শুভানন, আদিত্য, রিক্তা, দেবানুরাগ, তথাগত, কোয়েল, উত্তম, নীলিমা, ঐতিহ্য, মৌসুমি, পুণ্যব্রত, সিদ্ধার্থ, ঋতব্রত, অভীক, সৌম্যদীপ, ঋতব্রত, মৈনাক।

পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাইঃ

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE STUDENTS' COUNCIL

CHEMIX
One Stop Solution For All Special Gas Needs

SHARANYA
multi-speciality hospital

GBS GLOBAL BIOSCIENCE SOLUTIONS
TRUST US WITH YOUR NEEDS
Industrial | Pharma | Analytical | Life Science

ARTS

BI

IN ASSOCIATION WITH সন্দেশ

ap advanced photonics

MARUTI TRADERS

AJEL BUILDING CONTRACTS

N. MOHAN RAJ
FRUIT & VEGETABLE STALL



আইআইএসসি শারদীয়া দুর্গোৎসব কমিটি